# শুকতারা

মহাকাশের আজব দেশে

সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ • ১৪০১


কিন্তু শেষপর্যন্ত বাদুকুর হাড়টাকে ধরতে পারলো আর জিক্স ওর কস্ট্রোলবক্সের বোতামে চাপ দিলো।

যে পাউডার ও হাড়ে লাগিয়েছিলো ওটা বিস্ফোরক ছিলো। এখন ওটা চোখ ঝলসানো দীপ্তি বিকীর্ণ করে সশব্দে ফেটে শূন্যে উড়ে গেলো।

দুম!

হতচেতন আর নিমীলিত চক্ষু বাদুকুর আকাশ থেকে আছড়ে পড়লো।

কি মজার কাণ্ড। এখন অন্য সব কুকুরেরা প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ দেখে বাদুকুরকে সংহার করার জন্যে তাড়া করলো।

এখন দ্যাখ্, ওকে দৌড়োতে হচ্ছে।

কুকুর শিক্ষা কেন্দ্র

জিক্স আর টুই আশাতিরিক্তভাবে আজ যুদ্ধে জয়লাভ করলো। ওরা শুধু ক্যাপ্টেন ক্যাপ আর বাদুকুরকেই পরাস্ত করলো না সেই সঙ্গে ওরা দাম্ভিক কুকুর ট্রেনার মিঃ কেরীকেও উচিত শিক্ষা দিলো।

গরর্! আমরা আমাদের পোষ্যদের তোমার কাছে ট্রেনিং দিতে এনেছিলাম!

আমরা আমাদের টাকা ফেরত চাই!

এখন ওরা একদলে বন্য কুকুরের মতো আচরণ করছে!

বাঁচাও! হেল্প!

## পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

## একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

# ডায়মন্ড কমিক্‌সে

## কার্টুনিস্ট প্রাণের চিরনতুন চরিত্র

1 to 16

কুরুক্ষেত্রে হওয়া কুরু-পান্ডবের ধর্ম-যুদ্ধের অত্যন্ত সজীব চিত্রন। যে যুদ্ধে পান্ডবেরা বিজয়ী হয়েছিল। যে কোনও বয়সের পাঠকের জন্য অত্যন্ত রোচক এবং সংগ্রণীয়। মূল্য–15/-

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রামের ঘটনা প্রধান জীবনের অত্যন্ত রোমাঞ্চক কাহিনী। বাচ্চা-বুড়ো সবার জন্য সমান-ভাবে মনোরঞ্জক। মূল্য–15/-

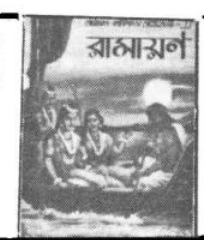


ডায়মন্ড কমিকস্ প্রা লি ২৭১৫, দরিয়াগঞ্জ, নূতন দিল্লী-১১০ ০০২
DISTRIBUTORS VISHAL BOOK CENTRE 4, TOTTEE LANE CALCUTTA-16 PH. 2447816, 2443709

# বাঁটুল দি গ্রেট

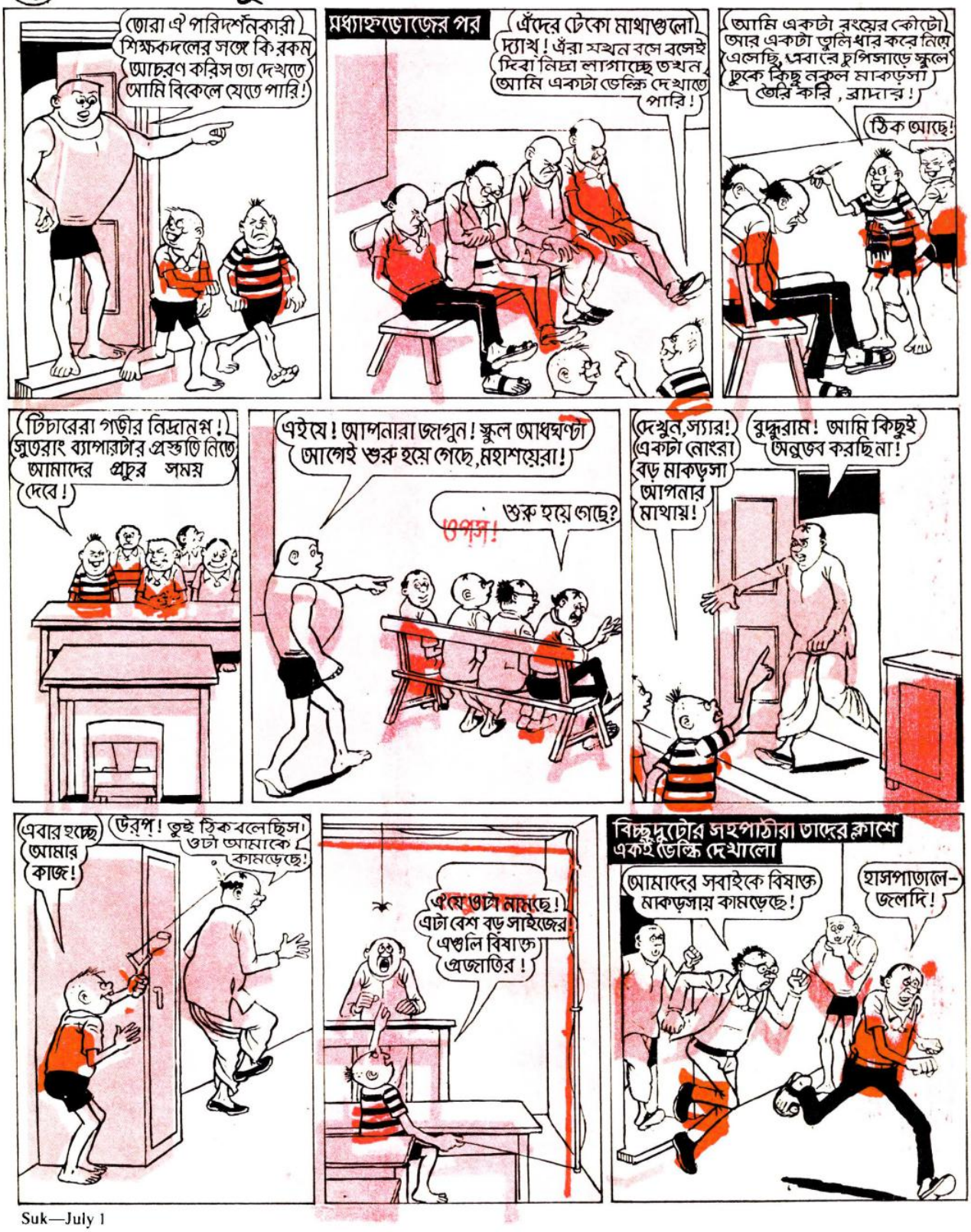
তোরা ঐ পরিদর্শনকারী শিক্ষকদলের সঙ্গে কি রকম আচরণ করিস তা দেখতে আমি বিকেলে যেতে পারি!
মধ্যাহ্নভোজের পর
এঁদের টেকো মাথাগুলো দ্যাখ! এঁরা যখন বসে বসেই দিবা নিদ্রা লাগাচ্ছে তখন আমি একটা ভেল্কি দেখাতে পারি!
আমি একটা রংয়ের কৌটো আর একটা তুলিধার করে নিয়ে এসেছি, এবারে চুপিসাড়ে স্কুলে ঢুকে কিছু নকল মাকড়সা তৈরি করি, ব্রাদার!
ঠিক আছে!
টিচারেরা গভীর নিদ্রামগ্ন! সুতরাং ব্যাপারটার প্রস্তুতি নিতে আমাদের প্রচুর সময় দেবে!
এইযে! আপনারা জাগুন! স্কুল আধঘণ্টা আগেই শুরু হয়ে গেছে, মহাশয়েরা!
শুরু হয়ে গেছে?
ওপস!
দেখুন, স্যার! একটা নোংরা বড় মাকড়সা আপনার মাথায়!
বুদ্ধুরাম! আমি কিছুই অনুভব করছি না!
এবার হচ্ছে আমার কাজ!
উরপ্! তুই ঠিক বলেছিস। ওটা আমাকে কামড়েছে!
এ যে ওটা নামছে! এটা বেশ বড় সাইজের! এগুলি বিষাক্ত প্রজাতির!
বিচ্ছুদুটোর সহপাঠীরা তাদের ক্লাশে একই ভেল্কি দেখালো
আমাদের সবাইকে বিষাক্ত মাকড়সায় কামড়েছে!
হাসপাতালে- জলদি!

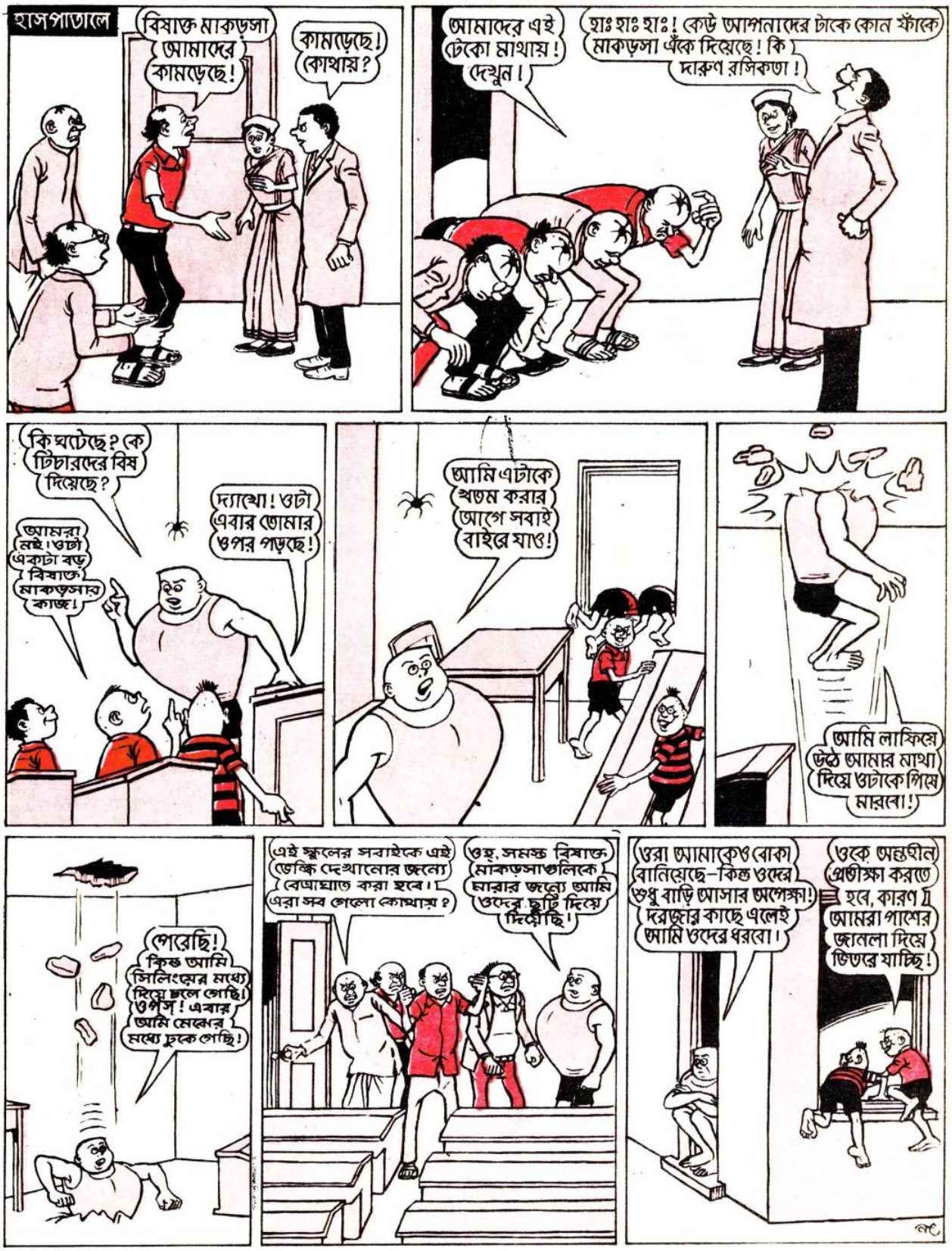
হাসপাতালে
বিষাক্ত মাকড়সা আমাদের কামড়েছে!
কামড়েছে! কোথায়?
আমাদের এই টেকো মাথায়! দেখুন।
হাঃ হাঃ হাঃ! কেউ আপনাদের টাকে কোন ফাঁকে মাকড়সা এঁকে দিয়েছে! কি দারুণ রসিকতা!
কি ঘটেছে? কে টিচারদের বিষ দিয়েছে?
আমরা নই! ওটা একটা বড় বিষাক্ত মাকড়সার কাজ!
দ্যাখো! ওটা এবার তোমার ওপর পড়ছে!
আমি এটাকে খতম করার আগে সবাই বাইরে যাও!
আমি লাফিয়ে উঠে আমার মাথা দিয়ে ওটাকে গিয়ে মারবো!
পেরেছি! কিন্তু আমি সিলিংয়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেছি! ওপস! এবার আমি মেঝের মধ্যে ঢুকে গেছি!
এই স্কুলের সবাইকে এই ডেস্কি দেখানোর জন্যে বেত্রাঘাত করা হবে। এরা সব গেলো কোথায়?
ওহ্, সমস্ত বিষাক্ত মাকড়সাগুলিকে মারার জন্যে আমি ওদের ছুটি দিয়ে দিয়েছি!
ওরা আমাকেও বোকা বানিয়েছে—কিন্তু ওদের শুধু বাড়ি আসার অপেক্ষা! দরজার কাছে এলেই আমি ওদের ধরবো।
ওকে অন্তহীন প্রতীক্ষা করতে হবে, কারণ আমরা পাশের জানলা দিয়ে ভিতরে যাচ্ছি!

সূচীপত্র
শ্রাবণ ১৪০১
জুলাই ১৯৯৪

# শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

প্রচ্ছদ
মহাকাশের আজব দেশে
—নারায়ণ দেবনাথ
সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী
জোরাণ্ডা ডাকবাংলোয়
—রামকৃষ্ণ দত্ত ৩৬
গল্প
জটাধরের বৃত্তান্ত—কুমার মিত্র ৬
আজহারের লকেট—তৃষিত বর্মন ২৯
ভূতের গল্প
ডাক দিয়েছিল সুদাম
—অসীম চট্টোপাধ্যায় ১১
পৌরাণিক গল্প
গোপালদাদার গল্প—শান্তি সিংহ ৬৮
হাসির গল্প
অঙ্কবিহারী—বলরাম বসাক ৭০
পুরস্কৃত গল্প
শিক্ষা (প্রথম)—সবিতা হালদার ৪৮
উপহার (দ্বিতীয়)
—অরিন্দম মণ্ডল ৪৮
বিজ্ঞান বিচিত্রা
অমর বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন
—ডাঃ মনীশ প্রধান ৫১
ভ্রমণ
নচিকেতা তাল—রমেশ দাস ২০
অমর বাঙালী
ইতিহাস-উপেক্ষিত পৃথু
—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩
ফিচার
ডাকহরকরার কাহিনী
—অরুণকুমার সেনগুপ্ত ২৮
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ২৩
ভবিষ্যতের ঠিকানা
—ডি·এ·চন্দ্রণ ২৬
বিশ্ববিচিত্রা
জিজ্ঞাসা ৬৫
সত্যি! ৫০
কবিতা
ইচ্ছে হলে—শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
পাষণ্ড রায়—সুবীর গুপ্ত ১৪

ক্রীড়াঙ্গন
খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
হল্যান্ডের স্ট্রাইকার বাস্তেন
—সুমন ভট্টাচার্য ৬০
পড়ার সঙ্গে খেলা—বীরু বসু ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৬২
বিভাগীয় লেখা
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৩৩
ছবিতে গল্প
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪৬
সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক অভিযান
(রঙিন)—পল্লব পূততুণ্ড
ও দোলা পূততুণ্ড ১৮
জিপসীদের দলে
ম্যাম'জেল এক্স ২৪
বিলির বুট ৬৬
ঘোষণা
অম্বুজাক্ষ সেন স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতা ৪৯
জানো কী ৩৫

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
**By Air Mail Rs. 552.00**

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দামঃ ৮ টাকা মাত্র

# নিউ বেঙ্গলের সাহিত্য সম্ভার

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**বিদেশিনী**

অগ্নিমিত্রর
**দেশ থেকে দেশান্তর**

ডঃ দীপক চন্দ্র
**হরিবংশ**

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের **ক্রিকেট মাঠের বাইরে**

ক্রিকেট মাঠের বাইরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। নেপথ্যে সেই সব ঘটনা খেলোয়াড়দের জীবনকে হাসি-কান্নার দোলায় দুলিয়ে দেয়। গল্প উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী নিয়ে এই প্রথম বাংলায় একটি বই বেরুলো।

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যর
**পেরুতে সূর্য লাল**

দিলীপ ভট্টাচার্যর
**প্রবাস প্রেম**

আভা বসুর
**সাগর দুহিত**

দেবনারায়ণ গুপ্তর
**বাংলার নট-নটী**

শতদল ভট্টাচার্যর
**নিশুতি রাতের মহাত্মা**

ময়ূখ চৌধুরীর
**দেবী দর্শন**

ডাঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর
**বিপন্ন প্রকৃতি**

রাধারমণ রায়ের
**অদ্ভুত গোয়েন্দ**

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(নতুন সংস্করণ)

**ক্রিকেট খেলার আইন কানুন**
**ফুটবল খেলার আইন কানুন**
**ফুটবল ক্রিকেটের আইন**

দীপঙ্কর বিশ্বাসের
**মজানো দশ**

অরুণ সর্দারের
**অনাহূত**

আশুতোষ মন্ডলের
**নতুন আলো**

নিউ বেংগল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

# শুকতারা

৪৭শ বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● শ্রাবণ ১৪০১ / জুলাই ১৯৯৪

## ইচ্ছে হলে

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

এই হাতে চাঁদ ধরতে পারি,
এই হাতে, নীল তারা!
'চাঁদ' নিবি? না, 'নীল-তারা' চাই?
আয় দেখি, হাত বাড়া!

ইচ্ছে হলেই 'জোছনা' ধরি,
এই হাতে, এই হাতে!
মাঠ, বন আর নদীর চরেই
পূর্ণিমারই রাতে!

সেই মাঠ, বন, নদীর চরায়,
দুধ-সাদা সেই জোছনা গড়ায়,
নিঝুম, নিঝুম রাতে!
বাড়িয়ে আমার এ হাত দুটো,
জোছনা ধরি, কয়েক মুঠো;
মনটা যখন মাতে!

চাঁদ, তারা বা জোছনাধারা
ইচ্ছে হলে, নিবি!
তার বদলে, তোদের 'খুশি'র
একটু তো 'ভাগ' দিবি!!

ছবিঃ অমল চক্রবর্তী

# জটাধরের বৃত্তান্ত

## কুমার মিত্র

জটাধরের বাপ ছিল সিঁধেল চোর। জটাধর বাপ কা বেটা। সেও চোর বনে গেল। তবে সিঁধকাঠি দিয়ে চুরিচামারির যুগ তো এখন নেই, ওসব সাবেককালের ব্যাপার। গাঁ-গেরামে কাঁচাবাড়ি পাওয়াই দুষ্কর—তা সিঁধকাঠি কি কাজে লাগবে? বাপ মারা যাবার পর যন্তরটা টেঁকিশালায় অকেজো হয়ে পড়ে থেকে থেকে জং ধরে গেল। জটাধর মালকোঁচামারা কাপড়ের কষিতে ছোরা গুঁজে চুরি করতে যায়। চুরিবিদ্যে মহাবিদ্যে—এ কথা সে জানে এবং মানে। বলতে কি, এ কাজে ওর এলেমও আছে। ব্যবসা ওর মন্দ চলে না, কেননা পাড়া-গাঁয়ের লোকের হাতেও আজকাল পয়সাকড়ির অভাব নেই। তবে রাতকুটুম হিসেবে যতই পাকা হোক, বার দুই জেলও খাটতে হয়েছে। জেল-টেলের পরোয়া অবিশ্যি করে না জটাধর। ওর ভয় গণধোলাইকে। কথাটা শুনতে নিতান্ত খারাপ নয়। কিন্তু জিনিসটা কি সাংঘাতিক তা নিজের চোখে ও দু'একবার দেখেছে। সে দৃশ্য শুধু চোখে দেখলেই ভিরমি লেগে যাবার জো। ওই পিটুনির ভয়েই জটাধর মাঝে মাঝে ভাবে চুরি করা ছেড়ে দেবে। কিন্তু নেশাটা এমন বিতিকিচ্ছিরি যে সুযিঠাকুর মুখ লুকোলেই দিনের বেলার সব পিতিজ্ঞে ভুলে যায় সে।

জটাধরের এক ছেলে। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। লম্বা লম্বা পা, হরিণের মতো ছুটতে পারে। বুদ্ধিটাও বেশ সাফ। সাহসও কম নয়। জটাধর ভেবেছিল ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবে। কিন্তু ওপরঅলার মর্জি বুঝবে সাধ্য কার? ছেলেটাও বাপের রাস্তা ধরল। গ্রামের তুফান চৌকিদার নিশিকুটুম্বদের আনাগোনার সব খবরই রাখে। জটাধরকেও ভালরকমই জানে-চেনে। চৌকিদার একদিন দিনমানে জটাধরকে ডেকে বলল, 'তোর ছেলেটার বড্ডো বাড় বেড়েছে। তোদের দেখছি তিন পুরুষের খানদান। এতদিন গেরস্থকে ঘর সামলাতে বলেছি, এবার চোরকেই বলতে হচ্ছে। এখনও সময় আছে, বদ রাস্তা থেকে ছেলেটাকে সরিয়ে আন। না হলে পরে পস্তাতে হবে।'

বাড়ি ফিরে জটাধর ছেলেকে খুব বকাঝকা করল, ভাল ভাল কথা শোনাল। কিন্তু চোরা কবে ধম্মের কাহিনী শুনেছে! ছেলের মতিগতি ফিরল না। একদিন রাত-ডিউটিতে বেরিয়ে ছেলে আর ফিরে এল না। পরের দিন চার মাইল দূরের এক গাঁ থেকে খবর এল ছেলেটা ইস্টিশান শহরের এক মস্ত কারবারীর তিন দেউড়িওয়ালা বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেখানে সপ্তরথী নয়, সাতশো মানুষ ওকে ঘিরে ফেলে। তারপর অভিমন্যুর মতোই সেই ব্যূহের মধ্যে ও একেবারে লাশ হয়ে যায়।

চোর-ছ্যাঁচড় হলেও বাপের প্রাণ তো। জটাধর বেজায় দুঃখ পেল। দুঃখে এমন মুষড়ে পড়ল যে সাত দিন বাড়ি থেকেই বেরোল না সূর্যাস্তের পরও। চুরি ব্যাপারটার ওপরই ওর কেমন ঘেন্না ধরে গেল। ঠিক করল এবার থেকে ও ভাল হয়ে যাবে। মানুষের ভাল করার সাধ্যি নেই ওর, তবে মন্দও আর করবে না। তারপর এক রাতে কাউকে না জানিয়ে লোটাকম্বল নিয়ে—মানে ঝোলাতে কিছু পয়সা আর জামাকাপড় নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়ল। ওর শূন্য বাড়িটা দেখে পাড়াপড়শিরা বলাবলি করল, 'আহা, শোকটা বড্ডো লেগেছে। মানুষটা বোধহয়

বিবাগী হয়ে গেল।'

জটাধর ঘরছাড়া হয়ে বেশ একটা মুক্তির স্বাদ পেল। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, যা কপালে জোটে তাই খায়। দু'চোখে যেখানে ঘুম জড়িয়ে আসে সেখানেই শুয়ে পড়ে—সে গাছের তলায় হোক কি হাটবাজারের আটচালা হোক। কিন্তু এক জায়গায় বেশিদিন থাকা হয় না; কৌতূহলী মানুষের তো অভাব নেই, পুলিশের ভয়ও আছে। আবার এভাবেও চলে না, এক জায়গায় থিতু হয়ে বসতে পারলে ভাল হয়। যাই হোক ঘোরাঘুরি করতে করতে একদিন অনেক দূরের এক গাঁয়ে গিয়ে হাজির হলো জটাধর।

জায়গাটি ভারি মনোরম। চারধারে দেদার মাঠ, বিস্তর গাছগাছালি, কয়েকটি চাষা-গাঁ। একটা ছিমছাম চেহারার নদীও বয়ে গেছে। এখানের মানুষের মনমেজাজও মাটির মতোই নরম। জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল জটাধরের। নদীর ধারে শ্মশানের কাছে একটা পোড়ো ঠাকুরঘর দেখে আস্তানা নিল সেখানে। নামেই ঠাকুরঘর। আসলে ছিটেবেড়ার দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা চৌচালা। তাও এখন জীর্ণদশা। তবে গরীব মানুষের কাছে এটাই রাজপ্রাসাদ। জটাধরের এখানে থাকতে বিশেষ কষ্ট হয় না। নদীর জলে স্নান-পান দুই-ই চলে। দু'মুঠো চাল-ডাল-আলু ফুটিয়ে খায়। দিব্যি দিন চলে যায়। বিকেল হলে নদীর ধারে চুপচাপ একা বসে থাকে। এই ছোট নদীতে নৌকো-চলাচল নেই, তাই মানুষের সাড়াশব্দও কম। শান্ত জলের নদী, বিশেষ ঢেউ খেলে না। জটাধর মনে মনে ভাবে তার বুকের ভেতরটাও যদি অমন নিঃসাড় নিঢেউ হতো! তা তো হয় না। সেখানে যে অনেক ঢেউয়ের ওঠাপড়া, অনেক কানাকানি, ফিসফিসানি।

ছোট্ট গাঁয়ের শ্মশান। লোকজনের আনাগোনা কম। তবু মাঝে মধ্যে কেউ না কেউ আসে মৃতের সদগতি করতে। দূর থেকে তারা জটাধরকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'জব্বর সাধু। দেখলে ভক্তি হয়।' সেসব কানে আসে জটাধরের। মনে মনে হাসে সে, আবার দুঃখও পায়। লোকগুলো কাকে কি বলছে জানে না। তাদের দিগরের মানুষ এত সাদাসিধে নয়।

লোকগুলোর আর দোষ কি! জটাধরকে দেখলে মতিভ্রম হবারই কথা। মাথায় মাঝারি, চমৎকার গড়নপেটন, নাকমুখে ধার আছে। গায়ের রঙে তামা-তামা ভাব। এক মাথা ভোমরাকালো চুল, ঘাড়ের দিকে বাবরির ঢল নেমেছে। ইদানীং দাড়ি রেখেছে সে। বয়স কম হয়নি। কিন্তু বয়স বোঝবার জো-টি নেই এমনি চেহারার ধাঁচ। তা-বাদে বেশ কিছুকাল সে রাতচরানি আর নেশাভাঙ থেকে দূরে আছে, তাতেও চেহারায় একটা ভদ্র ভাব এসেছে। খরচ কম পড়বে বলে কিছুদিন হলো গেরুয়া পোশাক ধরেছে। তাতেও খোলতাই হয়েছে চেহারাটি। জটাধর নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে বাইরে সে খানিকটা বদলে গেছে। আহা, মনটাও যদি বদলে যেত! যায়নি, টের পায় সে।

একদিন বিকেলবেলা নদীর ধারে আসনপিঁড়ি হয়ে অন্যদিনের মতোই বসেছিল জটাধর। সাত-পাঁচ ভাবছিল আপনমনে। এমন সময় ভারি মিষ্টি গলায় কে ডাকল, 'সন্ন্যিসিঠাকুর।'

জটাধর চমকে উঠে মুখ ফেরাল। দেখল একজন মাঝবয়েসী চাষীগোছের লোক তার দিকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। ভারী নিরীহ চেহারার মানুষটি। ভক্তি মাখানো মুখ, বিনীত ভঙ্গি। গলায় হরিনামের মালা।

'আমাকে বলছ?' শুধলো জটাধর।

'আর কেউ তো নেই এখানে, কাকে আর বলব! তা দেবতা, দয়া করে যদি আমাদের গাঁয়ে এলে তবে এই শ্মশানভুঁয়ে কেন? আমার বাড়ি চলো প্রভু। চাষাভুষো লোক আমি, টাকাকড়ি তেমন নেই, তবে আদর-যত্নের অভাব হবে না। দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারব।'

সন্ন্যিসি! দেবতা! প্রভু! লোকটা বলে কি! জটাধর বাস্তবিকই অবাক। তামাসা মন্দ নয় তো! দিনকাল এখন কতো বদলে গেছে, মানুষ হয়ে গেছে চালাকচতুর। সাধু দরবেশের ওপর কারো কারো ভক্তি এখনও অবিশ্যি আছে কিন্তু তাদের দু'হাতের আঙুলে গোনা যায়। সেই যুগে লোকটা তাকে ঠাকুর-দেবতা ভেবে বসে আছে! জটাধরের একবার ইচ্ছা হলো মানুষটার ভুল ভেঙে দেয়। তারপর কি ভেবে থমকে গেল।

জটাধর ভেবে দেখল এই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনাটাকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না। হাতের পয়সাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে। দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াতে তার ভারি অরুচি। শ্মশানে যারা শবদাহ করতে আসে তাদের কেউ-কেউ যৎসামান্য দয়াদাক্ষিণ্য দেখায় বটে, তবে তা দিন চলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একটা পাকাপাকি হিল্লে হওয়া খুবই দরকার। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে পস্তাতে হবে। এইসব ভেবে, বাইরে একটু টালবাহানা দেখিয়ে, অতটুকু না দেখালে নয় আর কি, চাষীর কথায় রাজী হয়ে গেল জটাধর।

চাষীর নাম কুঞ্জ মান্না। কুঞ্জর বার-বাড়িতে একটা সদরঘর গোছের ছিল। ওখানেই ঠাঁই হলো জটাধরের। তা কুঞ্জ মান্না মানুষ সত্যিসত্যিই খুব ভাল। গরীব লোক, কিন্তু যত্নআত্তির শেষ নেই। একেবারে গুরুর আদরে রেখে দেয় তাকে। কি মিষ্টি গলায় যে তাকে 'গুরুঠাকুর' বলে ডাকে সে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত। চাষী-বৌ আর এক কাঠি সরেস। সে জটাধরকে ডাকে 'গোরাঠাকুর' বলে। কর্তা-গিন্নি পারলে তাকে বুঝি মাথায় তুলে রাখে। এমন যত্ন-আদর জীবনে কখনও পায়নি জটাধর। দিনকয়েকের মধ্যে তার চেহারা আরো ফিরে গেল।

এইসব অজ পাড়াগাঁয়ে সাধুসন্ন্যিসিদের আজো অন্যরকম চোখে দেখে মানুষ। ক্রমশ চারদিকে রটে গেল কুঞ্জচাষীর বাড়িতে মস্ত এক সাধু-মহারাজ এসে উঠেছে। অমনি সকাল সন্ধ্যেয় কুঞ্জর বাড়িতে পুণ্যাত্মা দর্শনের ধুম লেগে গেল। প্রথম প্রথম দর্শন

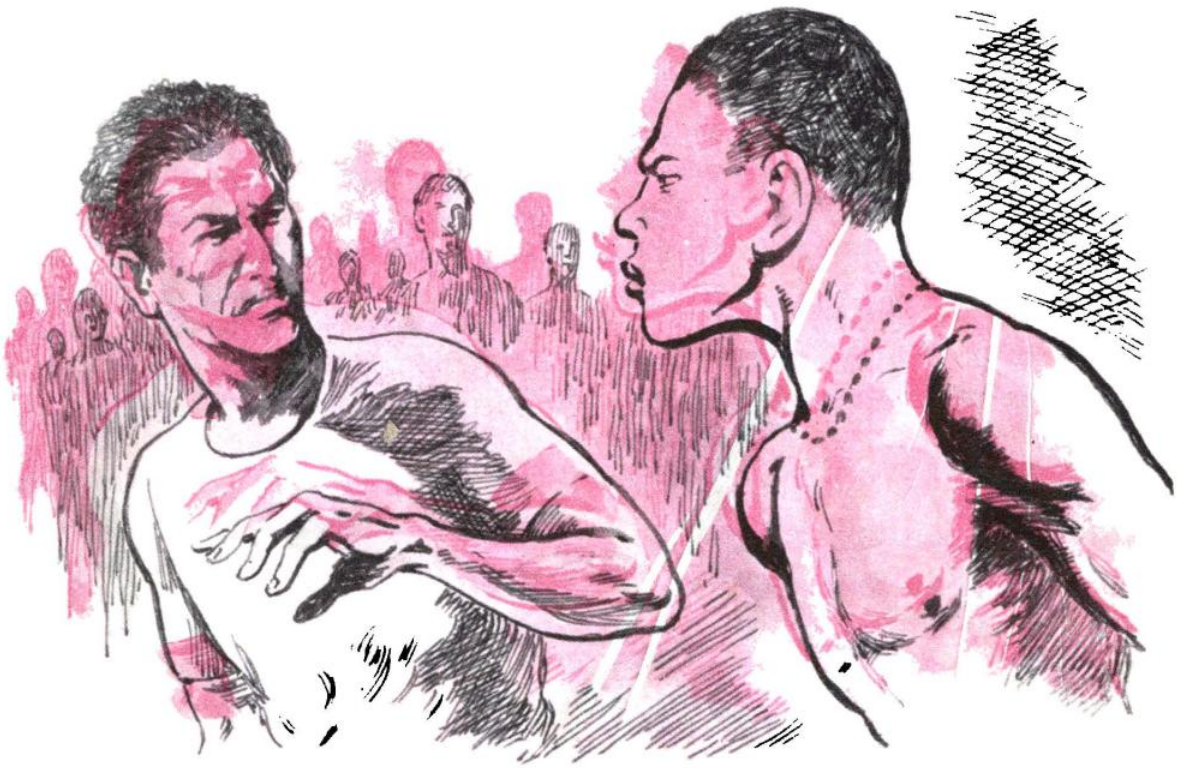

'কাকে দেখতে কাকে দেখেছ ঠিক কি!'

করেই খুশি। তারপর লোকেরা ধান্ধা নিয়ে আসতে লাগল। সাধু-ফকিরদের দৈবক্ষমতা থাকবে না, এ তো হয় না। প্রথমদিকে জটাধর বোঝাবার চেষ্টা করল তার কোনো আশ্চর্য ক্ষমতা নেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা! লোকের বিশ্বাস যে সাধু যতো দর্শনধারী সে ততোই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। জটাধরকে তাই অনিচ্ছে থাকলেও কারো হাত দেখে ভাগ্য বলে দিতে হয়, কারো পুরনো অসুখের ওষুধ বাৎলাতে হয়। তা বাদে জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, কবচ-তাবিজ তো আছেই। সবটাই বুজরুকি—এ পাঠশালায় কবে আর পড়েছে জটাধর! কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড, ওর আন্দাজী ওষুধ-বিষুধ লেগেও যায় বেশ। ভাগ্যগণনাও অব্যর্থ বলতে গেলে। সাধু জটাধরের বেশ নাম হয়ে গেল চারধারে।

কুঞ্জ মান্নার খুশির শেষ নেই। কেন না সে-ই তো সন্ন্যিসি মহারাজকে রাস্তা থেকে তুলে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। লোক চিনতে সে ভুল করেনি, সবাই বলাবলি করে। কুঞ্জর ভক্তির বহরও বেড়ে গেছে জটাধরের নামডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। জটাধরের পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম সেরে তবে কাজে বেরোয় মান্নামশাই। কাজ সেরে ফিরেও তার প্রথম কাজ আর একটা পেন্নাম করা। প্রণামের সময় মাঝে মাঝে বলে ফেলে, 'সাক্ষাৎ ভগবান তুমি সন্ন্যিসিঠাকুর। গিন্নী বলে—গোরাঠাকুর, গোরাচাঁদ। তা ঠিকই বলে। যার নাম গোরাচাঁদ তার নামই ভগবান।' জটাধরের ইচ্ছে হয় কানে আঙুল দেয়। সাহস হয় না। কাকে যে কি বলে এরা! সে কিনা এদের নিমাই সন্ন্যাসী!

ভক্তরা যখন সাধু-দর্শনের পাট চুকিয়ে বাড়ি চলে যায়, চাষীবাসীরা অন্দরমহলে দুয়োরে খিল দিয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে বসে আর ছোট্ট গাঁ-টা ঘন অন্ধকারে ভারী নির্জন-নিঃসাড় মনে হতে থাকে, তখন জটাধর তার বার-বাড়ির আস্তানায় একলা বসে কতো কি যে ভাবতে থাকে তার ঠিকঠিকানা নেই। আগেকার কথা মনে পড়ে যখন সে খুব খারাপ মানুষ ছিল। এইসব গহীন অন্ধকারে ঢাকা রাতে তার মাথায় কিরকম শয়তানি ভর করত। এখন এরকম ঝুলকালি-মাখা কতো রাত চোখের ওপর দিয়ে চলে যায়, তবু একটি বারও তার আর নিশিকুটুম্ব হবার সাধ হয় না। ছেলেটা মারা যাবার পর উদাসী-বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ঠিকই, তা বলে সাধু-সন্ন্যিসি বনে যাবার বাসনা তার ছিল না। ভেবেছিল দিনকতক পর মনটা ঠিক হয়ে গেলে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে পুরনো পেশাতেই মন দেবে। কিন্তু সব বদলে গেল। জটাধর পরিষ্কার টের পায় তার ভেতরটাও আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। সে আর আগের মানুষটি নেই। চাষী আর তার বৌ তাকে শুধু খাঁটি সাধু কেন, প্রায় ভগবান

বলে ভাবে। শুনতে শুনতে তার গা শিউরে ওঠে, নিজেকে কেমন অ-সাধারণ আর মহৎ মানুষ বলে মনে হতে থাকে। আহা, সত্যিই যদি সে দেবতুল্য হয়ে উঠতে পারত—দেবতাদের মতোই সৎ করুণাময়!

জটাধর ভাবতে থাকে—আর এখানে নয়। চাষী, চাষী-বৌ আর লোকজনকে ঠকাচ্ছে সে। নকল সাধু নয়, সত্যিকার সাধু হতে হবে। এখানের ভোগে-সুখে থেকে সেটা সম্ভব নয়। চাষীকে বলে, এখানের মায়া কাটিয়ে চলে যাবে সে। খুব শীগগির। কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠল না জটাধরের। ঘটনাচক্রে আটকে গেল।

কুঞ্জ মান্নার দু'ছেলে ছিল। বড়ো ছেলেটা পানবরুজে কাজ করতে গিয়ে সাপে কাটা পড়ে মারা যায়। সে বছর দুই আগেকার কথা, জটাধর তখনও আসেনি এ-বাড়িতে। তা ছোট ছেলেটিই এখন কুঞ্জর একমাত্র ছেলে। বছর সতের বয়স। লেখাপড়া করে, আবার বাড়ির কাজও করে। ভারি ভালো ছেলে। নম্র, বিনয়ী, খুব ভক্তি করে জটাধরকে। সেই ছেলেটি হঠাৎ খুব অসুখে পড়ল। এক নাগাড়ে জ্বর, অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থা, ভুল বকে। গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারকে ডাকল কুঞ্জ। রুগী দেখে ডাক্তার মুখ গম্ভীর করল, বলল, 'শক্ত ব্যামো। আরাম হতে সময় লাগবে।'

সময় গেল, কিন্তু রুগীর আরাম হবার নাম নেই। গতিক আরো খারাপের দিকে।

কুঞ্জ আর তার বৌ এসে জটাধরের পায়ে পড়ল, 'বাড়িতে সাক্ষাৎ ভগবান থাকতে তাকে ডাকিনি, ডেকেছি ডাক্তারকে। সেই পাপে ছেলে বুঝি বাঁচে না। তুমি ওর প্রাণ ফিরিয়ে দাও ঠাকুর।'

জটাধরকে কে যেন চাবুক মারল। চমকে উঠে বলল, 'আমি!'

কুঞ্জ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি। তুমি তো সব পারো। তোমার অসাধ্য কি আছে? ওই আমাদের একমাত্র সন্তান বাবা।'

এদিকে কুঞ্জর বৌ সেই যে পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে আর ছাড়েনি।

জটাধর সত্যি কথাটাই বলবার চেষ্টা করল, 'আমি সাধারণ মানুষ, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি আসলে—'

কথাটা শেষ হলো না, তার আগেই কুঞ্জ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'তোমার পায়ে মাথা কুটব। বাঁচিয়ে দাও আমার ছেলেকে।'

নিরুপায় হয়ে জটাধর বলল, 'পা ছাড়ো। চলো দেখে আসি তোমার ছেলেকে।'

রুগী দেখে জটাধরের মুখে আঁধার ঘনিয়ে এল। সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারল তাড়াতাড়ি বড়ো ডাক্তারের ব্যবস্থা না করতে পারলে একে ফেরানো শিবেরও অসাধ্য।

'কেমন দেখলে বাবাঠাকুর?' কুঞ্জ ব্যাকুল গলায় শুধলো।

'একটু খারাপের দিকেই গেছে। তবে ভয় নেই।'

'তুমি থাকতে আমার ভয় কিসের ঠাকুর?'

জটাধর পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ওর করার কিছু নেই। বুজরুকির


আপনি কি হারাচ্ছেন
জানেন কি?

গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের

পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের

দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের

তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম. ও. করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

কারবার এখানে চলবে না। তবু চাষীর মন রাখতে একটা কিছু করতে হয়।

নিজের ঝোলা থেকে শেকড়-বাকল বের করে খাইয়ে-টাইয়ে দিল, জলপড়া দিল। নানারকম প্রক্রিয়া, তুকতাক, মন্ত্রপাঠ—সব মিলিয়ে এমন সব কাণ্ড করল যাতে মনে হবে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীই বুঝি এসেছে। তারপর বলল, 'যা করবার তো করলুম। এখন একবারটি বড়ো একজন ডাক্তার ডেকে দেখিয়ে নিলে ভাল হয়।'

কুঞ্জ কপাল চাপড়ে বলল, 'সে তো লোকেও বলছে। তা অতো আমার পয়সা কোথায়? এক গাদা টাকা ভিজিট। মাইল চার দূরে মস্তো একজন ডাক্তার আছে। সে তো পাঁচ কুড়ি টাকার কমে আসবেই না। এত টাকা তো আমার নেই ঠাকুর।'

জটাধর কপাল কুঁচকে একটুখানি কি যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে বোধহয়। দেখি কি করা যায়', এই বলে রুগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

বার-বাড়ির আস্তানায় এসে এক ঠাঁই চুপচাপ বসে রইল জটাধর। রাতের খাবার স্পর্শ করল না। ঘুমোতেও গেল না। ওকে ভারী অস্থির দেখাচ্ছিল। মনের ভেতরে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন চলছে। কোনো একটা সিদ্ধান্তে যেন পৌঁছতে চাইছে অথচ পারছে না। তারপর রাত যখন অনেক, ছোট্ট গাঁ-টার সমস্ত আলো নিভে গেছে, ভূত আর চোর-ডাকাতদের উৎপাতের সময় ঘনিয়ে এল, জটাধর সাধু আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে হারিয়ে গেল অন্ধকারের সমুদ্রে।

সারারাত্রি জেগে থেকে কুঞ্জ আর তার বৌ রুগীর বিছানার পাশেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, ফুটব-ফুটব করছে ভোরের আলো, হঠাৎ রুগীর ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল আর কে যেন গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'এগুলো রেখে দাও। ডাক্তারের ভিজিট।'

ধড়মড় করে জেগে উঠে চাষী আর চাষী-বৌ ঘুমজড়ানো চোখে দেখল পাঁচমিশেলি নোটে আর খুচরোয় একরাশ টাকা মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। ওরা অবাক! যেমনি অবাক এমন ভোররাতে জটাধরকে আসতে দেখে। জটাধর বড়ো একটা অন্দরমহলে পা দেয় না, অসময়ে তো নয়ই।

'সারারাত কি ঘুমোওনি নাকি ঠাকুর?' কুঞ্জ ভারী ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'না। টাকার যোগাড়ে গিয়েছিলুম। তুমি এখুনি ডাক্তার আনতে চলে যাও। আর আমিও চলি।' জটাধর কেমন অদ্ভুত গলায় বলল।

কুঞ্জ তক্ষুণি ছুটল। সময়মতো ডাক্তার এল। ওষুধ পড়ল। ডাক্তার বলল, 'আর একদিন দেরি হলে তোমার ছেলেকে ফেরানো যেত না।'

বিকেলে রুগীর অবস্থা যখন বেশ ভালোর দিকে, কুঞ্জর মনটাও শান্ত হয়ে এসেছে, হঠাৎ খেয়াল হলো ঠাকুরমশাইয়ের আজ সকাল থেকে খোঁজ নেওয়াই হয়নি। অথচ ওঁর দয়াতেই তো তার ছেলেটা বাঁচল। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বার-বাড়িতে ছুটল। কিন্তু কি দেখল?

ঘরখানা ফাঁকা। কম্বলের বিছানা তেমনি পাতা আছে। কুঁজোয় জল তেমনি ভর্তি। গেল রাতের খাবার যেমন ছিল তেমনি আছে। সবই আছে, কেবল মানুষটা নেই। আর নেই গেরুয়া ঝোলাটা।

আশপাশে বৃথাই খোঁজাখুঁজি করল কুঞ্জ। গেল কোথায় সাধুঠাকুর? কুঞ্জ এমনভাবে হুতোশ ফেলতে লাগল যেন তার কোনো আপনজনকে হারিয়েছে। সাধু চলে গেছে শুনে যারা ওর বাড়িতে জড়ো হয়েছিল তারা ওর কষ্ট দেখে সান্ত্বনা দেবে কি, নিজেরাই চোখ মুছতে লাগল। কেউ কেউ বলল, 'বড়ো ভালো সাধু ছিল।'

সন্ধ্যের মুখে পাড়ার মথুর মাইতি সাংঘাতিক খবর আনল। সে রোজ ইস্টিশান-শহর ফুলেশ্বরে কাজ করতে যায়। ওখানেই থানা। মথুর বলল, 'সাধুকে পাবে কোথায়? তাকে তো থানার লোকেরা গারদে পুরেছে।'

'কি রকম?' লোকেরা বলে উঠল।

'শোননি কাল রাতে বাজিতপুরের বাজারে মস্তো চুরি হয়ে গেছে? গোলদারি দোকানে। যে লোকটা ঘুমচ্ছিল দোকানে তার হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ক্যাশ-বাক্সয় যা ছিল সব হাতিয়েছে। লোকটা পষ্ট দেখেছে চোরকে। সাধুর মতো পোশাক।' মথুর বলল।

'তুমি দেখে এলে নাকি?'

'দেখলুম বৈকি। অবিকল জটা সাধু।'

কুঞ্জ কান্না থামিয়ে হাঁ করে মথুর মাইতির কথা শুনছিল। সে এবার ভীষণ রেগে, একেবারে অ-বোষ্টমসুলভ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সাধু-মহাত্মার নামে দোষ দিও না বলছি। কাকে দেখতে কাকে দেখেছ তার ঠিক কি! অবিকল জটা সাধু! সাধুরা অনেকটা একই রকম দেখতে হয়, তা জানো?'

মথুর মাইতি পালাতে পথ পায় না।

মথুর কিন্তু ঠিক খবরই দিয়েছিল। তবে একটা খবর সে জানত না। থানাবাবুরা জটাধরকে ধরে নিয়ে যায়নি। সে নিজেই ধরা দিয়েছিল।

ছবি: প্রসাদ রায়

# ডাক দিয়েছিল সুদাম

## অসীম চট্টোপাধ্যায়

সে অভিজ্ঞতা জীবনে ভোলার নয়। সুদাম, বাবলা, আমি—তিন মূর্তি মাঝরাত্তিরে আম চুরি করতে যাবো গলায়-দড়ির বাগানে। শ খানেক বছর আগে মজুমদার বাড়ির কোন এক বৌ নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল ওখানে, তাই ও-বাগানের নাম গলায়-দড়ির বাগান। ঐ বাগানেই মজুমদারদের বিখ্যাত গোলাপখাস আমগাছ। নাম শুনলেই জল আসে জিভে। গরমকাল। গাছটা আমে ভরভরন্ত। দিনের বেলায় পাড়ার জো নেই। কাজে কাজেই মাঝরাত্তিরে। দুপুরেই প্ল্যান পাকা আমাদের তিন মূর্তির। আজ রাতেই অপারেশন গোলাপখাস।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ জানলায় টোকা। চুপিচুপি বাইরে এসে দেখি সুদাম একা। ফিসফিসিয়ে শুধোই, কিরে, বাবলা কোথায়?

সুদাম জানায়, বাবলার বাবা হঠাৎ কলকাতা থেকে এসে পড়েছেন সন্ধ্যের সময়। ও আজ বেরোতে পারবে না।

একটু ছাঁৎ করে ওঠে বুকটা। আমাদের মধ্যে বাবলাই সবথেকে ডাকাবুকো। ও সঙ্গে থাকা মানেই বাড়তি একটা জোর। একে চুরির কেস, তায় আবার গলায়-দড়ির বাগান বলে কথা। এমন দিনে বাবলাটাকে সঙ্গে না পাওয়ার কোনো মানে হয়?

সুদাম বলল, দেরি করিসনি, তাড়াতাড়ি চল।

অগত্যা আমরা দুজনেই এগোই। সুদামের হাতে একটা বস্তা। বোঝাই করে আম আনা হবে।

পেরিয়ে গেলুম নন্দীদের বাঁশঝাড়। এখানটায় এলেই কেমন যেন গা-ছমছম করে। বাঁশঝাড় পেরিয়ে মুচিরডাঙার জঙ্গল। রাত নিঝুম। শুকনো পাতায় আমাদের পায়ের শব্দ। মুচিরডাঙা পেরিয়ে পায়ে পায়ে গলায়-দড়ির বাগানের সামনে আমরা। চাঁদের আলোয় চিকমিক করছে পাশের খানাপুকুরের জল। খানিক দূরেই গোলাপখাস আমগাছটা।

সুদামের চোখ ওপর দিকে। গাছভর্তি আমের মেলা। আমি একবার চারপাশটা দেখে নিলুম। কেউ দেখে ফেললে পিটিয়ে তক্তা করে দেবে। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল ভয়ংকর দৃশ্যটা।

আমার আর সুদামের মাঝখানে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে এক হিলহিলে খরিশ গোখরো! মুখটা সুদামের দিকে। ভয়ে আতঙ্কে কাঠ আমি। একটু এদিক-ওদিক হলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ও ছোবল বসাবে আমারই শরীরে। চেঁচিয়ে সুদামকে সাবধান করার মতো সাহসও তখন নেই আমার।

পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে ফণা নামাল গোখরোটা। 'মাগো' বলে আর্তনাদ করে উঠল সুদাম। ছিটকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলুম আমি। সরসর করে সাপটা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

মাটিতে পড়ে ছটফট করছে সুদাম। বাঁধার মতো দড়িদড়া নেই হাতের কাছে। ধরে ধরে সুদামকে নিয়ে চললুম ওর বাড়ির দিকে। রাস্তায় সুদাম বলল, সাপটাকে তুই আগে দেখতে পাসনি সন্তু?

লজ্জায় সত্যি কথাটা বলতে পারিনি। বলেছিলুম, না রে।

চাঁদের আলোয় সুদামের চোখে মৃত্যুভয় দেখেছিলুম আমি। আকুল গলায় ও বলেছিল, আমি বাঁচবো তো সন্তু?

সুদাম বাঁচেনি। সাপে কামড়ানোর অ্যান্টি-ভেনম ইঞ্জেকশন আমাদের গাঁয়ে পাওয়া যায় না। ওর বাবা ওঝা ডেকেছিলেন। ঝাড়ফুঁক, হাতচালান করেছিল ওঝারা। মন্ত্র পড়েছিল অনেক। সুদাম বাঁচেনি। বাবলা শ্মশানে গিয়েছিল। আমার সাহস ছিল না যাওয়ার।

এই ঘটনার বছর দুয়েক পরের কথা। আমরা তখন ক্লাশ নাইনে পড়ি। গরমকাল। গোলাপখাস আমগাছে আবার আমের সমারোহ। লোভ হয়, মন টানে, কিন্তু জোর করে চোখ ফিরিয়ে রাখি। এই দু বছরের মধ্যে ওধার আর মাড়াইনি আমরা।

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে আছি ঘরে। গরমে ঘুম আসছে না। দেয়ালঘড়িতে ঢং করে ঘণ্টা বাজল। সাড়ে বারোটা। ঠিক তখন জানলায় টোকা। উঠে গিয়ে দেখি জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে বাবলা। হাতে একটা বস্তা। বললুম, কী ব্যাপার রে, তুই এখন?

ফিসফিস করে বাবলা বলল, গোলাপখাসের আম পাড়তে যাচ্ছি সন্তু। যাবি?

বুকটা কেঁপে উঠল। গোলাপখাস! খরিশ গোখরো, সুদাম, সেই ছটফটানি, দুচোখ জোড়া মৃত্যুভয়.....

শুকনো গলায় বললুম, ওখানে যাবি বাবলা?

বাবলা হাসল, ভয় পাচ্ছিস? আরে ভয় কি, আমি তো আছি। চলে আয়।

বাবলা ডাকছে। গোলাপখাস ডাকছে। অনেকদিন পর আবার অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি। থাকতে পারলুম না। চুপচাপ বেরিয়ে পড়লুম।

নিঝুম রাত। চাঁদের আলো। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। হাওয়া নেই। গুমোট। চারপাশ থমথমে। সারা গাঁ ঘুমোচ্ছে। আমরা দুজন হাঁটছি। সামনে বাবলা, পেছনে আমি। বাবলার হাতে বস্তা।

নন্দীদের বাঁশঝাড় পেরোচ্ছি আমরা। আগে অনেক রাতেই হেঁটেছি এ-পথে। কিন্তু গত দু বছরে হাঁটিনি। কেমন অন্যরকম লাগছে চেনা রাস্তাটা। হঠাৎ একটা কটু গন্ধ ভেসে এল। চেনা গন্ধ, কিন্তু মনে করতে পারছি না কিসের।

চাপা গলায় বললুম, গন্ধটা কিসের রে বাবলা?

চলতে চলতেই বাবলা বলল, চিনতে পারছিস না?

বললুম, খুব চেনা লাগছে, কিন্তু মনে করতে পারছি না।

বাবলা হাসল, একটু পরেই মনে পড়ে যাবে।

বাবলা এগোচ্ছে। পেছনে আমি। শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ। গন্ধটা পাক খাচ্ছে চারপাশে। কেমন ঝিমঝিম করছে মাথাটা। দু বছর আগের সেই ভয়ংকর রাতটা চোখের সামনে ভাসছে।

এই গরমেও হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। বুঝতে পারছি ভয় করছে। তবে সঙ্গে আছে বাবলা। দুর্দান্ত সাহসী। পৃথিবীতে একমাত্র বাবাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। আর দূর থেকে গোলাপখাস ডাকছে।

কিন্তু গন্ধটা? কিসের গন্ধ?

মুচিরডাঙার জঙ্গলে পা রেখেই থমকে দাঁড়ালুম আমি। সামনে বাবলা নেই! নিশুতি রাতে মৃত্যুর গন্ধমাখা জঙ্গলে আমি একা! চাঁদের টুকরোটাকরা আলো আর অসংখ্য গাছপালার ছায়ায় মুচিরডাঙা রহস্যময়ী। গন্ধটা ভাসছে চারপাশে। দূরে কোথাও কোনো রাতচরা পাখির ডানা ঝটপট। কাছেই কে যেন নিশ্বাস ফেলল জোরে। নড়ার শক্তি নেই। কপালে ঘাম জমছে। গলা

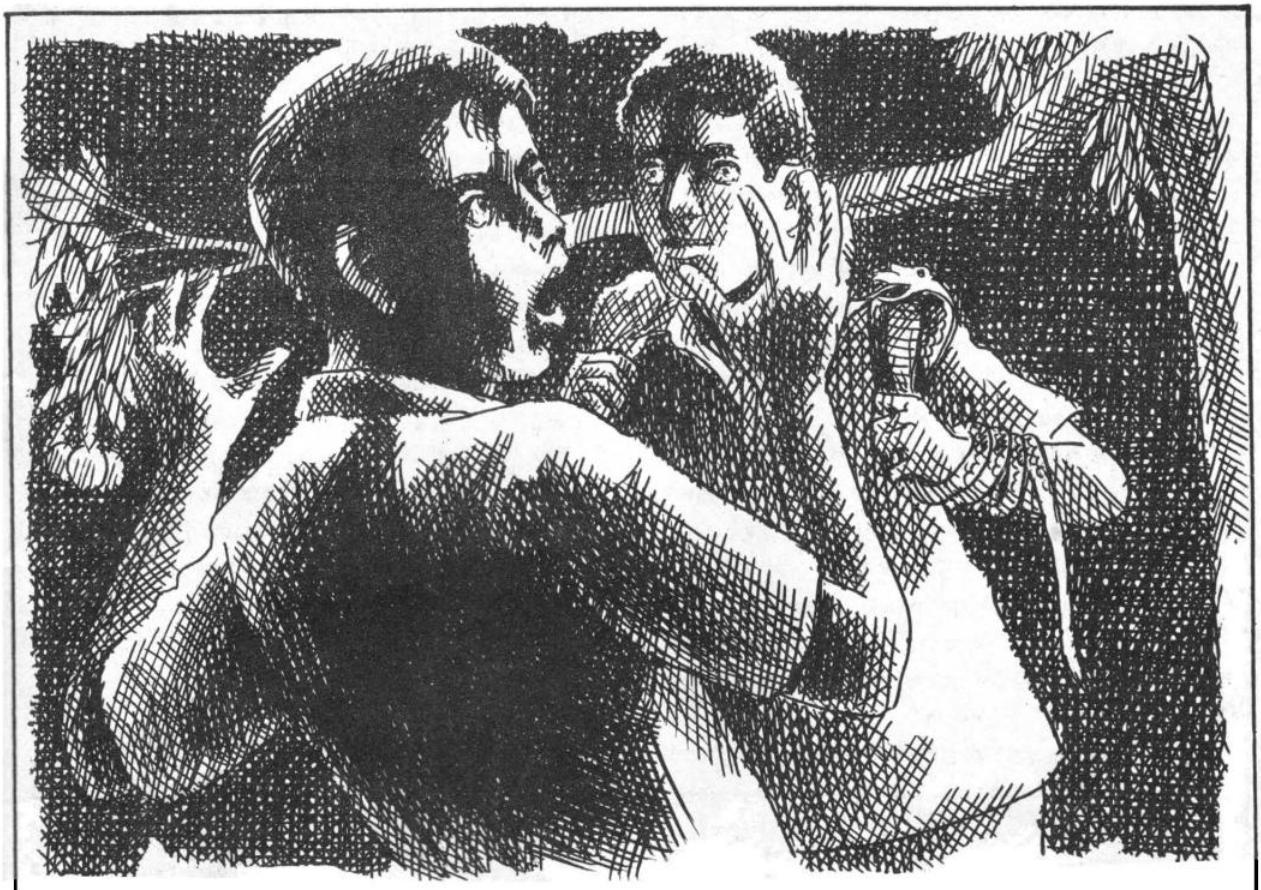

সুদামের হাতের মুঠোয় ভয়ঙ্কর খরিশ গোখরো।

শুকিয়ে কাঠ। কোনোমতে ডাকলুম, বাবলা, তুই কোথায়?

ঠিক পেছন থেকে উত্তর এল, এই তো, তোর পেছনেই।

মুখ ফিরিয়ে দেখি পেছনে দাঁড়িয়ে বাবলা হাসছে। ধড়ে যেন প্রাণ এল। কপাল বেয়ে টসটস করে ঘাম পড়ছে আমার। পা যেন চলতে চাইছে না আর। বললুম, আজ আর গিয়ে কাজ নেই বাবলা। ফিরে যাই চল।

বেপরোয়া গলায় বাবলা বলল, আরে দূর, কী যে বলিস! এত দূরে এসে ফিরে যাবো? চল, চল।

আবার পা বাড়ালুম আমরা। মুচিরডাঙার জঙ্গল পেরিয়ে গলায়-দড়ির বাগান। গন্ধটা এখনও ঘিরে রেখেছে আমাকে। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। চোখে পড়ছে গোলাপখাসের আমগাছ। পাশে খানাপুকুরের জলে চাঁদের আলোর মায়াবী জেল্লা।

হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়াল বাবলা, আর ঠিক তখনই কে যেন আর্তনাদ করে উঠল, মাগো!

আর্তনাদটা যেন আছড়ে পড়ল সারা জঙ্গল জুড়ে। থরথর করে কেঁপে উঠলুম আমি। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললুম, কে? কে চেঁচাল রে বাবলা?

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল বাবলা। বলল, আমি।

এ গলা বাবলার নয়। চমকে উঠে বললুম, কে?

উত্তর এল, আমি সুদাম।

দম বন্ধ হয়ে এল। সামনের মূর্তির মুখে চাঁদের আলো পড়ছে। হ্যাঁ, সুদামই! সেই বড় বড় চোখ, টিকোলো নাক, ঠোঁটের একটা কোণ একটু বাঁকা, কোঁকড়া-কোঁকড়া একমাথা চুল। দুবছর পর এই গলায়-দড়ির বাগানে নিঝুম রাতে আমার সামনে সুদাম!

সুদাম বলল, কত দিন গোলাপখাসের আম খাইনি সন্তু!

আমার গলায় স্বর ফুটছে না। শুধু বললুম, সুদাম, আমি....

ঝট করে বস্তার মধ্যে হাত ঢোকাল সুদাম। পরক্ষণেই বার করে আনল হাতটা। শিউরে উঠলুম আতঙ্কে। চোখ দুটো বোধহয় বেরিয়ে আসবে ঠিকরে। সুদামের হাতের মুঠোয় একটা ভয়ংকর খরিশ গোখরো!

চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে গন্ধটা। শ্বাস নিতে পারছি না। মৃত্যুভয় গ্রাস করছে আমাকে। কাঁপা গলায় বললুম, তুই আমাকে মেরে ফেলবি, সুদাম?

ঠাণ্ডা গলায় সুদাম বলল, তুই-ও তো আমাকে মেরে

ফেলেছিলি, সম্ভ।

সাপধরা হাতটা এগিয়ে আনছে সুদাম। কি ভয়ংকর প্রতিহিংসার আগুন ওর চোখে! আমি আর্তনাদ করে উঠলুম, আমায় মেরে ফেলিসনি সুদাম!

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চাইল সুদাম। তারপর সাপের মতোই হিসহিস করে বলল, সাপ সম্ভ, সাপ!

সুদামকে আর দেখতে পেলুম না। শুধু মনে হলো সাপটা আর সুদাম যেন মিশে গেল এক হয়ে। লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বিষধর খরিশ গোখরো। ফণাটা দোলাল কয়েকবার। তারপর চোখের নিমেষে ছোবল বসাল আমার শরীরে।

শেষবারের মতো আমি চিৎকার করে উঠলুম, সুদাম রে-এ-এ!

তারপর মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লুম মাটিতে। জঙ্গল কাঁপিয়ে কে হেসে উঠল হা-হা করে। আর চারপাশে সেই কটুগন্ধটা ....এতক্ষণে চিনতে পারলুম। শ্মশানে মড়াপোড়ার গন্ধ।

জ্ঞান ফিরেছিল পরের দিন দুপুরে। ভোররাত্তিরে আমাকে বাড়িতে না দেখে পাড়ার লোকেদের নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বাবা। গলায়-দড়ির বাগানে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পান তাঁরা।

ভিড় ফাঁকা হতে বাবলা চুপিচুপি বলেছিল, কোন সাহসে তুই একলা যেতে গেলি ওখানে? আমাকে তো ডাকতে পারতিস একবার?

ওর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কাল রাত্তিরে তুই কোথায় ছিলিস বাবলা?

বাবলা বলল, বাড়িতেই তো ছিলুম। গরমে ঘুম আসছিল না। তুই গিয়ে জানলায় টোকা দিলেই বেরিয়ে আসতুম।

চুপ করে গেলুম।

বাবলা বলল, হ্যাঁরে, সাপটাকে মারলি কী দিয়ে?

চমকে চোখ তুললুম, সাপ?

হ্যাঁ, তোর একেবারে পাশেই তো মরে পড়েছিল খরিশ গোখরোটা!

উত্তর দিতে পারিনি আমি। সুদাম সাপ ছেড়ে দিয়েছিল। সুদাম নিজে সাপ হয়ে ছোবল বসিয়েছিল। আমার শরীরের কোথাও কিন্তু সাপে কামড়ানোর কোনো চিহ্নই ছিল না। শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। তারপর কি গলায়-দড়ির বাগানের কোনো বিষধর খরিশ গোখরো সত্যিই কামড়াতে এসেছিল আমাকে? কে মেরেছিল সাপটাকে? সুদাম?

মড়াপোড়ার কটুগন্ধটা আবার ভেসে এসে ঘিরে ধরেছিল আমাকে।

ছবিঃ মদন সরকার

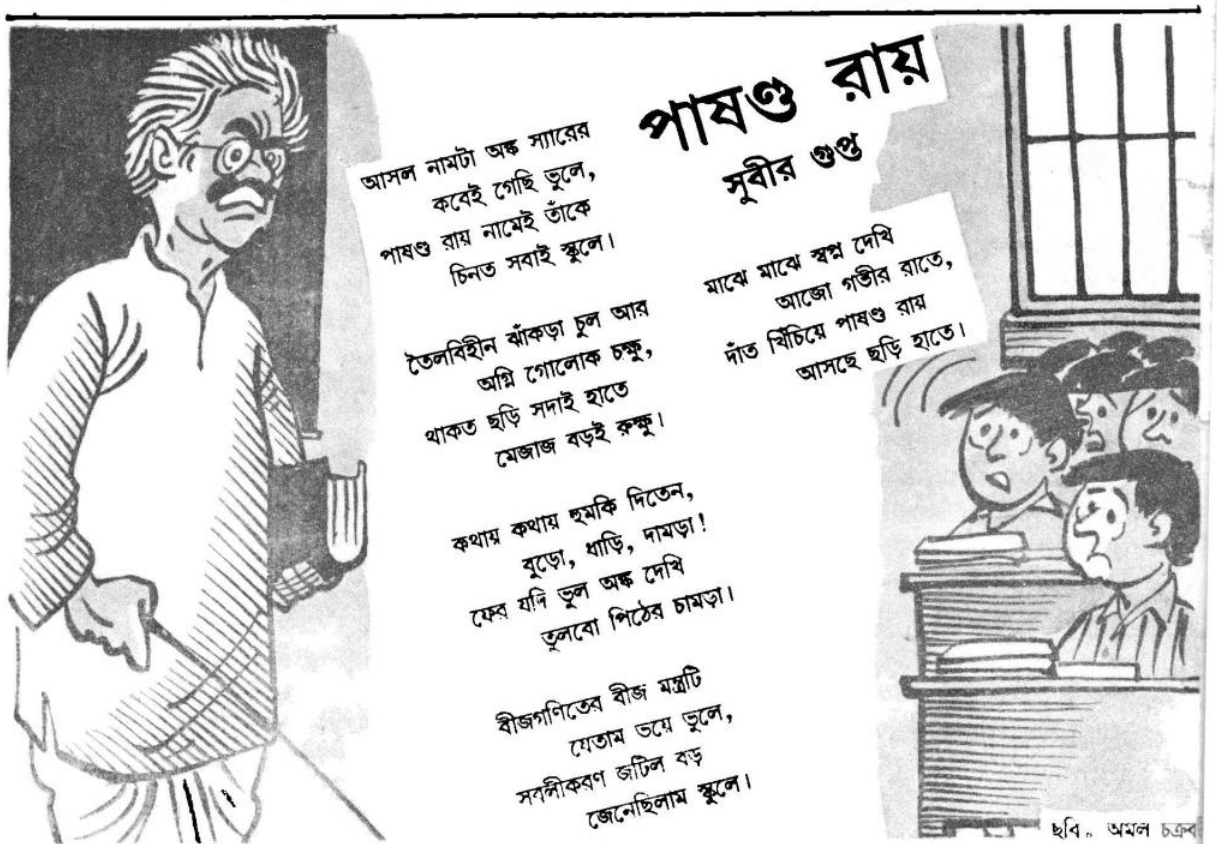


ছবি: অমল চক্রবর্তী

# দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

আকাশের এখন মুখভার। চোত-বোশেখের সেই দামাল হাওয়া এখন উধাও। কিন্তু ঈশানের কোণে কালচে মেঘের মুখ দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে অনেকের। ঐ বুঝি ভৈরব আবার আসে। তা এখন ভরা শ্রাবণে বৃষ্টি তো হবেই। যারা গ্রামে থাকো তারা তো দেখতেই পাচ্ছো জোড়া বলদ আর লাঙ্গল নিয়ে চাষীভাইদের চাষ করতে যাওয়ার দৃশ্য! এ সব প্রকৃতির রাজ্যের নিয়মবাঁধা কাজকর্ম। তবে আমরা তো আজকাল খোদার ওপর খোদকারি করি। স্যালো দিয়ে মাটির তলা থেকে জল টেনে তুলে বারো মাস চাষ চলে এখন। এ সবই বিজ্ঞানের দান। ভয় করে একদিন না এই আশীর্বাদ অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

ও সব কথা থাক। এবার তোমাদের চিঠির প্রসঙ্গে আসি। জলাঘাটা, সিঙ্গুর, হুগলি থেকে শুকতারার বন্ধু **মাতঙ্গিনী ভট্টাচার্য** কবিতায় চিঠি লিখেছে। দারুণ লিখেছ। ওর অভিযোগ একটাই—শুকতারার দাম। শুকতারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দাম না বাড়িয়ে যে উপায় ছিলো না।

**রোমি মিত্র** (৪র্থ শ্রেণী, সারদা স্মৃতি বিদ্যামন্দির, নবগ্রাম, হুগলি)

উত্তরঃ তুমি তো শুকতারার বন্ধু হয়েই গেছো।

**মানিকলাল মজুমদার** (c/o মণীন্দ্র মজুমদার, নিরঞ্জন নগর, বি ব্লক, পোঃ গারুলিয়া, উঃ ২৪ পরগনা)

উত্তরঃ যার কাছ থেকে পত্রিকা কেনো তাকেই জিজ্ঞেস করো সে কেন তোমায় দেরি করে শুকতারা দেয়। শুকতারা কিন্তু প্রত্যেক মাসে ঠিক সময়েই বেরোয়।

**পৌলমী সরকার** (বয়স ১৪, নবম শ্রেণী, জলপাইগুড়ি)

উত্তরঃ তোমার চিঠি আমি কিন্তু এই প্রথম পেলাম। তোমার চিঠি পেয়ে আমরা খোঁজ নিয়েছিলাম। তোমারও শুকতারা দেরিতে পাবার কোনো কারণ নেই। যিনি তোমায় শুকতারা দেন তাঁকে খুব বকে দাও। তুমি যদি গ্রাহক হতে চাও তাহলে টাকা M.O. করে পাঠিয়ে দাও। সেইসঙ্গে তোমার নাম আর ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে দিও, কেমন? আর আমায় জানিও, শুকতারা তোমার কেমন লাগছে। নতুন যদি কিছু চাও তাও জানিও।

**মুনমুন দাশ** (c/o সত্যেন্দ্রভূষণ রায়চৌধুরী, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ ৭৩৩১৩৪, উঃ দিনাজপুর)

উত্তরঃ ২৩৫ টাকা পাঠালেই হবে। প্রত্যেক মাসে বাংলাদেশে By post বই চলে যাবে। অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না। তবে বাংলাদেশে যার কাছে যাবে তার নাম ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখে দিও, তাহলেই হবে।

**দীপ মুখার্জি** (c/o সত্যনারায়ণ মুখার্জি, জামবাদ সিলেকটেড কোলিয়ারি (বেনেডি), গ্রাম-জামলিত, পোঃ-পড়াশিয়া, বর্ধমান)

উত্তরঃ তুমি একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় জেনে খুব খুশি হয়েছি। বোম্বাইএ রমাকান্ত আচরেকার অসুস্থ। উনি কি তোমায় খেলা শেখাতে পারবেন? তারচেয়ে বরং কলকাতায় সি. এ. বি. তে খেলা শেখার জন্যে চিঠি লেখো।

**গোপালচন্দ্র ভক্ত** (গ্রাম, রাজসহর, পোঃ পাতন্দা, মেদিনীপুর)

উত্তরঃ এখন তুমি কেমন আছো? চিকিৎসা আর ব্যায়াম করলে তুমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে। মন দিয়ে পড়ো। আর যখন যা ইচ্ছে হবে লিখে ফেলবে। পড়া আর লেখার চেয়ে বড় বন্ধু তো আর কেউ হতে পারে না। মনে রেখো শুকতারার বন্ধুরাও তোমার পাশে আছে। তুমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে। দেখো!

আর তো জায়গা নেই। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

# তোমাদের পাতা

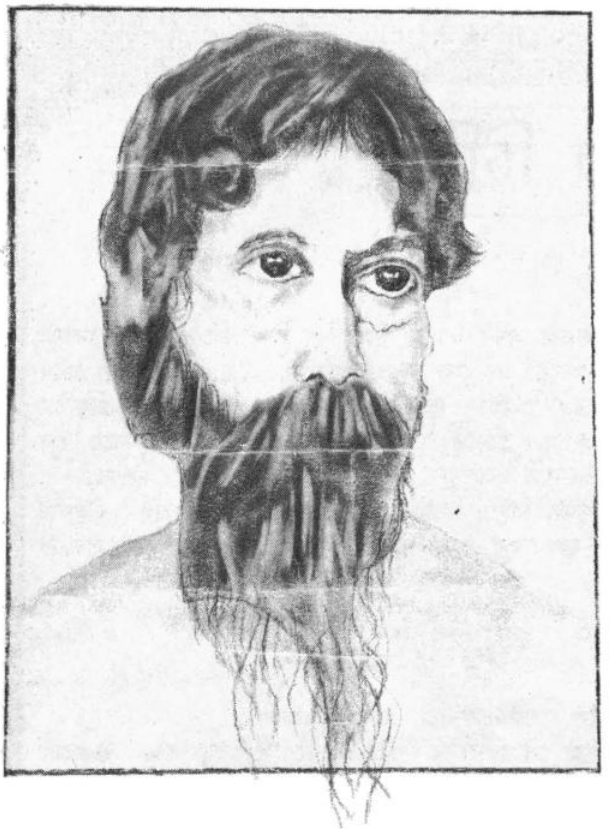

নারায়ণ ভাস্কর, বয়স চোদ্দ, সাহেবগঞ্জ, বিহার

## গাছ হওয়ার কষ্ট

ছোট্ট মেয়ে বুবুন। ফুল সে খুব ভালবাসে। তবে তার একটা খুব খারাপ অভ্যাস আছে। গাছে কোনো সুন্দর ফুল দেখলেই সেটা তুলে ফেলে। এর জন্যে সে মা-বাবার কাছে বকুনিও খায়। কিন্তু তার এই অভ্যাস কিছুতেই যায় না। এই তো এক মাস আগে বুবুনের বাবা একটা ডালিয়ার চারা এনেছিলেন। সেটাতে একটা সুন্দর ফুলও ফুটেছিল। ফুলটা দেখে বুবুন লোভ সামলাতে পারল না, তুলে ফেলল। মা খুব বকলেন। অভিমান করে বুবুন সেদিন দুপুরের খাবার খেল না, কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে বুবুনের মনে হলো ও যেন একটা সুন্দর গাছ হয়ে গেছে। কত সুন্দর দেখতে হয়েছে তাকে! সারা গায় সবুজ চকচকে পাতার বাহার আর মাঝে মাঝে সোনালী রঙের ফুল। বুবুনের খুব আনন্দ হলো। মায়ের বকুনি খাওয়ার জন্যে মনে আর একটুও দুঃখ রইল না। তার ছুটে ছুটে নাচতে ইচ্ছা করল, খেলতে ইচ্ছা করল। ছুটতে গিয়েই বাধা পেল বুবুন। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওমা, তার পা দুটো যে শেকড় হয়ে মাটির সঙ্গে আটকে গেছে! খুব কষ্ট হলো তার। কিছুক্ষণ পরই অবশ্য সে সব কষ্ট ভুলে গেল যখন দেখল একটা বাচ্চা মেয়ে তার সামনে এসে খেলা করছে। বুবুনের খুব ইচ্ছা করল মেয়েটির সঙ্গে খেলা করতে। সে মেয়েটিকে ডাকল। কিন্তু হায়! তার গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না। কত চেষ্টা করল বুবুন তবু কিছু হলো না। গাছ হয়ে সে যে কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে! মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল বুবুন। এমন সময় সে দেখল বাচ্চা মেয়েটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে এসে মেয়েটি ফুলে হাত দিল। বুবুন খুব খুশী হলো। ভাবল মেয়েটি তাকে আদর করছে। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটি বুবুনের গায়ের সব সোনালী ফুলগুলো একটি একটি করে তুলে নিতে লাগল। ব্যথায় চিৎকার করতে শুরু করল বুবুন। সে কিছুতেই মেয়েটিকে বোঝাতে পারল না যে তার কত কষ্ট হচ্ছে। এবার সে বুঝতে পারল গাছ হওয়ার কি কষ্ট! ইতিমধ্যে কয়েকটি ছেলে এসে ইচ্ছে করে তার ডাল ভেঙে পাতা ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করতে লাগল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বুবুন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতিরোধ করার শক্তি তো তার ছিল না। সে কাঁদতে লাগল। মায়ের জন্যে মন কেমন করতে লাগল বুবুনের। কাঁদতে কাঁদতে একসময়ে সে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। ঠিক তখুনি তার মনে হলো কে যেন তার গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে তাকিয়ে দেখল যে সে বিছানায় শুয়ে আছে, আর তার মা মাথায়-গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বুবুনের মনে পড়ল তার স্বপ্নের কথা। সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, কথা দিচ্ছি আর কোনোদিন গাছ থেকে ফুল তুলব না। এর পর থেকে বুবুন লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে গেল।

তোমরাও সবাই এখন থেকে বুবুনের মতো হবার চেষ্টা করো। মনে রেখো, গাছের প্রাণ আছে, তাদেরও আছে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা।

মৌসুমী ভড়, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, শ্রীরামপুর, হুগলী

### আগুন

হিন্দিতে তাকে বলে আগ
তার খুব রাগ,
তার ভয়ে পালায় বাঘ।
তার কাছে গেলে,
সব হয় পুড়ে খাক্।
ঘরে যদি লাগে আগ
সবাই বলে—ভাগ্, ভাগ্।

প্রসেনজিৎ কর্মকার,
বয়স নয়, পঞ্চম শ্রেণী, মদনপুর কেন্দ্রীয় আদর্শ বিদ্যালয়, নদীয়া

## গাছ কেটো না খবরদার

গাছ কেটো না খবরদার,
গাছ আমাদের পাওনাদার।
জনম ধরে গাছ আমাদের,
করছে উপকার।
গাছ আমাদের যোগায় পবন,
গাছ আমাদের আপনজন।
গাছ আমাদের ফুল দেয়,
গাছ আমাদের ফল দেয়।
গাছ আমাদের খাদ্য যোগায়,
গাছ আমাদের প্রাণ বাঁচায়।
গাছে থাকবে ভরা দু'পাশ,
গাছ কাটলে সর্বনাশ।
গাছ হলো যে একটি প্রাণী,
করব না তার জীবনহানি।
গাছ কেটো না খবরদার,
গাছ আমাদের পাওনাদার।

অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স এগারো,
ষষ্ঠ শ্রেণী, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা

## রামু চাচার জাগলিং

রামুচাচা রোজ রোজ
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে,
বল লোফে ডিশ ছোঁড়ে
দুটো হাত বাড়িয়ে।
মাঝে মাঝে তালে তালে
নাচে ধিন ধিন
সাথে সাথে খেলে যায়
কত জাগলিং।
ছোট বড় ছেলে-মেয়ে
জুটে যায় মেলা,
একমনে হাসি মুখে
দেখে যায় খেলা।
মজা পেয়ে শেষকালে
দিয়ে হাততালি,
চাচাজীর হাতে দেয়
ফুলভরা ডালি।

অভিষেক মিত্র, বয়স আঠারো, দ্বাদশ শ্রেণী,
উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

কুহেলী ভৌমিক,
বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী, শিশুবিতান, শিলিগুড়ি

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, বারাকপুর



অনুপম চৌধুরী,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
বাঁকুড়া জেলা স্কুল

## বর্ষার মজা

চারিদিকে জল, নেই কোনো গাড়ি,
অফিসফেরত মুখ করে হাঁড়ি,
বগলেতে ছাতা, হাতে লয়ে চটি,
বাবু ফিরিলেন বাড়ি।

মৌমিতা সেনগুপ্ত,
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
কমলা গার্লস স্কুল
কলকাতা



Suk—July 3

# সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক অভিযান

পল্লব গুহঠাকুরতা ● দোলা গুহঠাকুরতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

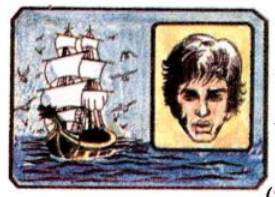

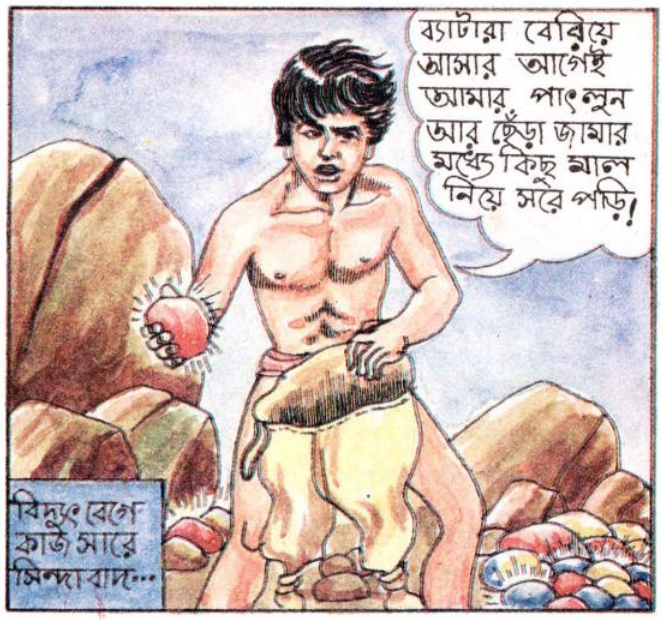

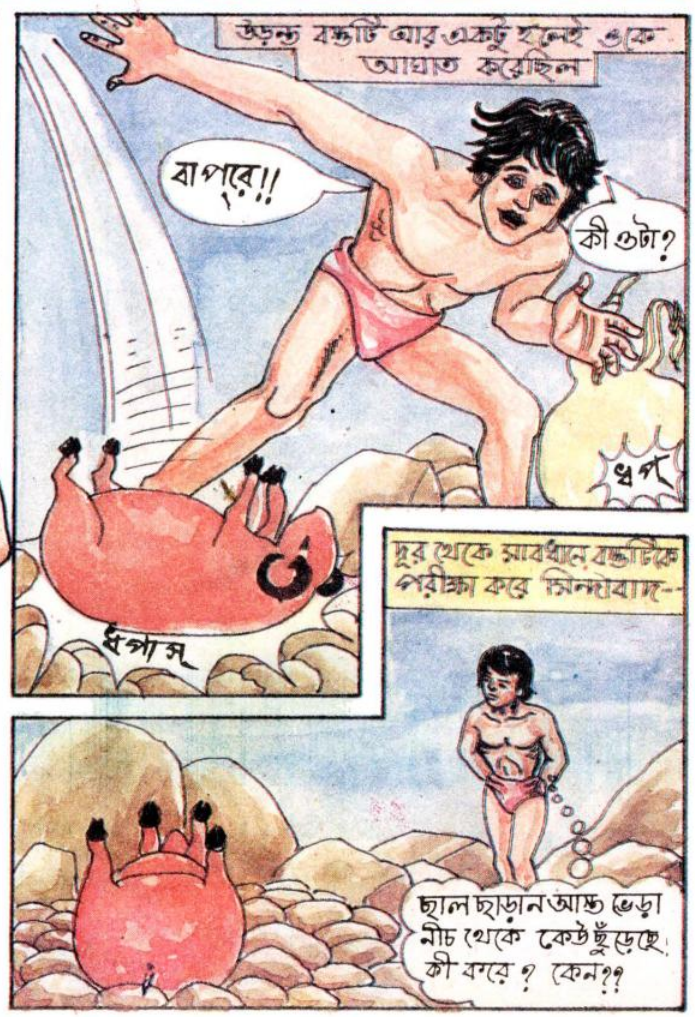

এটাই সবচাইতে উঁচু পাথর! উঠলে নীচটা দেখা যাবে!
তীব্র কৌতূহল দমন করার চাইতে চরিতার্থ করা সহজ পন্থা...
পাথরের আড়াল থেকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করতেই...
ব্যাপার তাহলে এই...!
ঐ সুবিশাল গুলতি-যান থেকে পাহাড় চূড়ায় ছুঁড়ে দিচ্ছে ছাল ছাড়ান মাংসের টুকরো... কী উদ্দেশ্যে?
পাথরের আড়ালে চটপট সেঁধিয়ে যায় সিন্দাবাদ...
মরেছে— আবার রকপাখী!
আকাশে ঝড় তুলে ছোঁ মারল বিশাল রক...
নিমেষে তুলে নিল মাংসের টুকরো

[চলবে]

# নচিকেতা তাল

রমেশ দাস

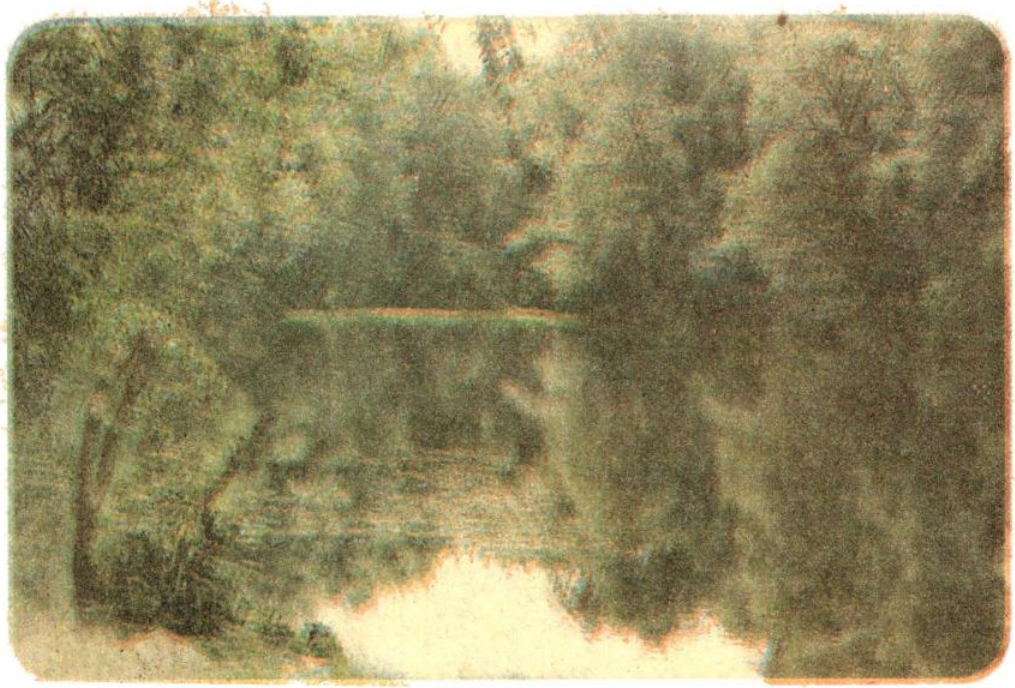

পাহাড়শীর্ষে নচিকেতা তাল

গঙ্গোত্রী থেকে ফেরার সময় দিনের শেষ বাস দুপুর আড়াইটেয় ছাড়ল। আমরা ফিরছি ভুর্জবাসার লালবাবা আশ্রম থেকে। গিয়েছিলাম গোমুখ। সেখান থেকে আরো চার কিলোমিটার দুর্গম পথে তপোবন-এ। হিমবাহের উপর দিয়ে

তালের এক প্রান্তে মন্দির

অজস্র মৃত্যুগহ্বর বা ক্রীভাস এড়িয়ে প্রায় ১৪,২৮০ ফুট উচ্চতায়।

বাসে বসেই এক বাঙালী আরোহীর মুখে শুনলাম আগামীকাল সমস্ত গাড়োয়ালে 'বন্‌ধ' পালিত হবে। শুনে আমরা বেশ হকচকিয়ে গেলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল রাতটা, কোনোরকমে উত্তর-কাশীতে কাটিয়েই ভোরে উঠে হৃষীকেশের বাস ধরব কিংবা মাঝপথে চাম্বাতে বাস বদল করে সেখান থেকে মুসৌরী যাব। কিন্তু বন্‌ধের দিন আমাদের কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না। একটি বা দুটি দিন স্রেফ মাটি । পর্যটকদের কাছে সময় নষ্ট হওয়া খুব বাজে ব্যাপার। বন্‌ধের পরের দিন কখন যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হবে কে জানে।

সব দিক ভেবে আমরা তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম উত্তর-কাশীতে যদি থাকতেই হয় তো হোটেল ভাড়া উশুল করব পায় হেঁটে শৈলশহরটি চষে বেড়িয়ে। উত্তরকাশী জেলার এটিই জেলা শহর। গঙ্গোত্রী এই জেলারই অন্তর্গত। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে আমাদের বাসটি এসে থামলো। ছাদ থেকে বোঁচকা-বুঁচকি নামিয়ে একটি হোটেলে উঠলাম।

বন্‌ধ খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল। কোনো যানবাহন চলেনি। দোকান-পাট বন্ধ ছিল। সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে ভাগীরথীর ঝুলা পুল পেরিয়ে চলে গেলাম পাহাড়ের শীর্ষে নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং-এ। বিকালে হলো মন্দির দর্শন ও শহর পরিক্রমা। তারপর ভাগীরথীর তীরে বসে গল্পে

গল্পে রাত হয়ে গেল।

ওই দিনই আমরা পরিকল্পনা করলাম সকালে উঠেই চলে যাব নচিকেতা তাল। উত্তরকাশী থেকে অন্য পথে যাওয়া যায় ভডিতাল। সেটি একদিনে সম্ভব নয়। তাছাড়া বাংলো বুকিং-এর ঝামেলাও আছে। কিন্তু নচিকেতা তাল এক দিনে দেখে ফেরা যায়। তাল মানে হ্রদ। আমাদের তপোবন-এর গাইড পণ্ডিত বাসুদেব এই হ্রদে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পণ্ডিত গাড়োয়ালী যুবক। তার কাছে জেনেছিলাম ভডিতাল একটি নদীর উৎসও বটে, কিন্তু নচিকেতা তালের জল বছরের পর বছর ধরা থাকে এক জায়গায়।

পরের দিন লম্বগাঁও গামী (ভায়া ধন্তোরী) বাসে চড়ে বসলাম। যাব চৌরঙ্গী খাল। উত্তরকাশী শহর ছেড়ে ভাগীরথীর পুল পার হয়ে আমাদের বাস পাহাড়ের গায় অনবরত পাক খেতে খেতে উঠতে থাকলো। নিচে বয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী। ঝাঁপ দিয়ে নামছে ঝরনা। ছবির মতো বাড়িঘর আর ধাপে ধাপে সাজানো সবুজ-হলুদ ধানক্ষেত। তারপর শুরু হলো ঘন চিড় গাছ। এত চিড় গাছ এই উত্তরকাশীর পাহাড় ছাড়া কোথাও দেখিনি। এমনকি গোমুখ যেতে চিড়বাসাতেও না।

বেশ কিছুটা ওঠার পর শুরু হলো মেঘের রাজত্ব। আমরা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সবকিছু স্যাঁতসেঁতে লাগছে। এক সময় মেঘ কেটে যেতেই দেখি আমরা মেঘের ওপরে। নিচে গাছের মাথায় মাথায় পেঁজা তুলোর মতো মেঘ লেগে আছে। চিড় গাছ শেষ হতে রাস্তার ধারে শুরু হলো এক অজানা গাছের জঙ্গল। কিছুটা লিচু গাছের পাতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। সহযাত্রী আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম এগুলি ব্রাঞ্চ ও বাঁশের জঙ্গল। বাসের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল পণ্ডিতের সঙ্গে। সে বাড়ি ফিরছিল। এখানেই ওর গাঁও। আমরা নচিকেতা তাল যাচ্ছি শুনে স্বেচ্ছায় ও আমাদের সঙ্গে যেতে চাইল। বিনিময়ে আমরা যা দেব তাতেই সে খুশি থাকবে। ছেলেটি খুব বিশ্বাসী। তপোবনেই সেটা টের পেয়েছিলাম। তাই আমরা তিনজনে ওকে সঙ্গী করব মনস্থ করলাম। বাস থামল। আমাদের চৌরঙ্গী খালে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। উত্তরকাশী থেকে লাগল পাক্কা দুঘন্টা।

চৌরঙ্গী খালে একটি পর্যটক বিশ্রামাগার আছে ইউ. পি. ট্যুরিজিমের। কিন্তু সেটা বন্ধ। চৌকিদার বাড়ি চলে গেছে। আমরা সামনের দোকানে পেটপুরে পরোটা, আলু-চচ্চড়ি ও চা খেয়ে নিলাম। খাওয়া শেষে শুরু হলো ট্রেকিং—নচিকেতা তাল।

চৌরঙ্গী খাল থেকে তিন কিলোমিটারের পাহাড়ী হাঁটাপথ, গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। আমরা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে চলার উপযোগী লাঠি বানিয়ে নিলাম। পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য বনবিভাগ পথের মধ্যে ১ কিমি অন্তর কংক্রিটের বসবার জায়গা করে দিয়েছে। মাথার ওপর ছাদ। কিন্তু অব্যবহারে সেগুলি অপরিচ্ছন্ন। জঙ্গলের গাছগুলি বেশ বড় ও বয়স্ক। তাদের ডালে ডালে বহুদিনের জমে থাকা শ্যাওলা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অর্কিডও। গাছের ডালগুলি নুয়ে পড়া। পণ্ডিত জানাল শীতের দিনে তুষার জমে থাকে বলে গাছের ডাল তার ভারে এমন নুয়ে পড়েছে। ঘন গাছপালার ফাঁকফোঁকর দিয়ে উপরের আকাশ ও বহু নিচের প্রান্তর মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল। এখানে হাঁটতে আমাদের তপোবন-এর মতো কষ্ট হচ্ছে না। তবে পাহাড়ী পথ তো, তাই মাঝে মধ্যে বিরতি টেনে দম নিতে হচ্ছিল।

কিছুদূর যাবার পর একটি ছোট সাপ আমাদের দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। কালো মসৃণ চিকচিকে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের ঝিলিক যেন। আমাদের এক বন্ধু বটব্যাল বলল, সাধারণে যে পথে চলাচল করে সেখান দিয়ে না গিয়ে আমরা যদি অব্যবহৃত পথ ধরি তাহলে অনেক বন্য জন্তু দেখতে পাব। বলা বাহুল্য, আমার বা আরেক বন্ধু অপূর্বর তাতে একেবারেই সায় ছিল না। একে অজানা অচেনা জঙ্গল, তারওপর পণ্ডিত জানাল এ বনে বিষধর সাপ ছাড়া চিতা ও ভাল্লুকও আছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ওঠার পর আমাদের পথ ঈষৎ ঢালু হলো। পণ্ডিত বলল, আমরা এসে গিয়েছি। কয়েকটি বনস্পতি লম্বালম্বি-ভাবে পড়ে আছে। তাদের ডিঙিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছি লাঠি হাতে। রাস্তায় শ্যাওলা জমে ও পাতা পচে পচে পথ হয়েছে পিছল। চলার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। সমস্ত পরিবেশ ভীষণ রকম স্যাঁতসেঁতে।

আমাদের সামনে সবুজে ছাওয়া স্নিগ্ধ এক জলাশয়। দারুণভাবে শান্ত। এতটুকু কম্পনও নেই তার জলে। পাড়ের কাছে কোথাও শ্যাওলা ও লতানে আগাছা মিলেমিশে তৈরি করেছে ভাসমান উদ্যান। যেমন দেখেছিলাম শ্রীনগরের ডাল হ্রদে। তুলনায় এ জলাশয়টি আকৃতিতে তার শতাংশের একাংশ মাত্র। তবু এই পাহাড় শীর্ষে গহন জঙ্গলের নির্জনে এরকম একটা ছোট্ট জলাশয় বড় বিস্ময়ের ও আনন্দের। এই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত নচিকেতা তাল।

এই নির্জন জায়গায় থাকেন একজন সাধু বাবা। অবশ্য আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর ভাঙা কুটির আর ছোট একটি মন্দির তালের এক প্রান্তে। আমরা কয়েকটি ছবি তুললাম। লেকের এক প্রান্তে একফালি ফাঁকা ঘাস জমি। আশপাশে বুনো ফুল ফুটে রয়েছে, আর রয়েছে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। আমাদের ফিসফাস কথায়ও যেন সেই নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হচ্ছিল। আমরা অবাঞ্ছিত এ রাজ্যে। চুপ করে থাকলে মনে হবে গাছেদের কথা বুঝি শোনা যাচ্ছে। কাছাকাছি একটি পাখি ডেকে উঠল সুমিষ্ট স্বরে। এক স্বর্গীয় প্রাপ্তি যেন ঘটে গেল জীবনে।

ফেরার সময় বটব্যাল ছিল বাসুদেবের সঙ্গে। আমি ও অপূর্ব কিছুটা পিছনে। এক জায়গায় এসে রাস্তা দুভাগ হয়েছে। তখন পণ্ডিত প্রস্তাব দিল সাধারণের পায় চলা পথ ছেড়ে শর্টকাটটা

ধরতে।

বটব্যাল ওর প্রস্তাব লুফে নিলেও আমি ও অপূর্ব আমাদের অনিচ্ছা জানাই। কিন্তু ওরা আগে থাকায় জোর করে ওই শর্টকাটের পথ ধরল। উদ্দেশ্য, নতুন কিছু দেখা। ওদের যেতে দেখে অপূর্বও ও-পথে গেল। রইলাম আমি। একবার ভাবলাম সাধারণের চলাচলের পথেই যাই, কিন্তু একা যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে ওদের অনুসরণ করলাম। ওঠার সময় দেড় ঘণ্টা সময় নিয়েছে, নামার সময় এক ঘণ্টা হওয়া উচিত। শর্টকাটে আরও কম আশা করব। প্রায় ৪৫ মিনিট হাঁটার পর পণ্ডিত মনের চাপা আশঙ্কা ব্যক্ত করল। সে পথ ভুল করেছে! আমরা এখন দিক্‌ভ্রান্ত।

গাছের ডালে মেঘের আস্তরণ। নিচের দিকে কিছু দেখা যায় না। দিকনির্ণয় সম্ভব নয়। সূর্য ঢাকা। সময় দুপুর। তার তো এখন মধ্যগগনে অবস্থান করার কথা। তখনও আমরা ভয় পাইনি। বললাম, বেশ শিক্ষা হয়েছে, এবার চলো সেই জায়গাটায় ফিরে যাই। ওখান থেকে সাধারণে যে পথে চলাচল করে সেই রাস্তায় নামব। বটব্যাল এখন কোণঠাসা। আমাদের প্রস্তাব তাকে মেনে নিতেই হলো। কিন্তু আমরা আর সেই দুই পথের সংযোগস্থলে ফিরে আসতে পারলাম না। পারলাম না নচিকেতা তাল পুনরায় দেখতে। সারা পাহাড়ময় কাঠুরিয়াদের পায়ে চলা পথ। আমরা ঠিক করলাম যে রাস্তা নিচে নেমেছে সেটাই ধরব। কিছুদূর যাবার পর দেখি সে পথও উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। এইবার আমরা সত্যি সত্যি ভেঙে পড়লাম। অপূর্বর মনে পড়ল বাঁকুড়ার জঙ্গলে হারিয়ে যাবার ঘটনা। আমারও মনে পড়ল আর এক বন্ধুর সঙ্গে ওমানের মরুভূমিতে রাতের আঁধারে পথ হারানোর কথা। বাসুদেবের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল আমার ও অপূর্বর। তবু ও রাগ করল না। বারবার তার ওপরে আস্থা রাখার কথা বলতে লাগল। ওর নির্দেশিত পথে আমরা না গিয়ে দ্বিতীয় একটি পথ ধরলাম। কেন না, এটি নিচের দিকে গেছে, আর যেহেতু কাঁটাতার দেওয়া তখন নিশ্চয় সরকারী রাস্তা। বাধ্য হয়ে বটব্যাল ও শেষে বাসুদেব আমাদের পিছনে এল। কিন্তু সমানে বলতে লাগল আমরা উল্টো পথে চলেছি। বলা বাহুল্য, কিছুদূর গিয়েই কাঁটাতার অদৃশ্য হলো। এবার আমরা করলাম কি, যেখানেই দেখি পথ দুভাগ হয়েছে অমনি অপেক্ষাকৃত ঢালু পথটাই বেছে নিই। চৌরঙ্গী খালের বাসস্টপেজে হয়তো পৌঁছতে পারব না কিন্তু এই পাহাড় থেকে নিচে তো নামা যাবে। রাতটা অন্তত কাটানো যেতে পারে দেহাতী কোনো গাড়োয়ালের কুটিরে। এই ভয়ানক পাহাড়ে রাত কাটানো মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু। যেখানেই দাঁড়াই জোঁকের ছোঁকছোঁকানি। বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। শেষ বাস চারটেয়। তার আশা ছেড়েছি। ভিজে পাতায় ও ঝরনার জলে পা পিছলে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে, দুবার পড়েও গেলাম। রাগ বাড়ছে বটব্যালের ওপর। ওর জন্যেই শেষ বাসটা ধরা যাবে না। এখনই তো দুটা বাজে।

এরকমভাবে বেশ কিছুটা ঘোরাঘুরির পর টাটকা গোবর চোখে পড়ল। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। গোবর যখন আছে তখন গরুর মালিকরাও আছে কাছাকাছি। কিছুদূর গিয়ে এক জায়গায় কিছু কৌটো-বাটা আর পুঁটলি চোখে পড়ল। পণ্ডিত জানাল ওগুলো পাহাড়ী মেয়েদের। ওখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করে ওরা আরও গভীরে গিয়েছে ঘাস, শুকনো কাঠ আর মোম সংগ্রহ করতে। আমরা আশ্বস্ত হলাম। লোকালয় আসছে তাহলে। এবার দেখলাম অনেক নিচে তিন-চার জন শক্তিশালী মানুষ কুড়ুল দিয়ে গাছের গুঁড়িতে আঘাত করছে। আমরা চলেছি তাদের থেকে তিন-চার তলা উপর দিয়ে। এবার আমাদের বিপরীত দিক থেকে এল দেহাতী দুজন পুরুষ। তারা চৌরঙ্গী খাল-এ আমাদের দেখেছে চা-পান করতে। এখন দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছে। তাদের কাছ থেকে জানলাম আমরা ঘুরপথে নেমেছি। তবে আর দেড় ঘণ্টায় বাসস্টপে পৌঁছে যেতে পারব। উত্তরকাশীতে ফেরার সম্ভাবনা এতক্ষণে বিশ্বাস করতে পারলাম। হোটেলে সবকিছু রাখা আছে। তাহলে ফিরতে পারব!

কিছুটা দূরে নিচের দিক থেকে বাচ্চাদের কোলাহল কানে এল। শুনে আমাদের যে কী আনন্দ হলো বোঝানো যাবে না। চোখে পড়ল একদল যাযাবর আস্তানা গেড়েছে। সঙ্গে প্রচুর ঘোড়া ও গরু। কথা কইছে নিজেদের মধ্যে, গাছের ডালপালা কাটছে চওড়া দা দিয়ে, মেয়েরা শিশুদের দেখাশোনা করছে। বড় বড় চোখে শিশুরা আমাদের দেখছে। কি সুন্দর এদের দেখতে! কি নিষ্পাপ চোখ-মুখ! বড়রা কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করল না। পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে মসৃণ চওড়া পিচরাস্তা। আমরা পাহাড়ী পথ ছেড়ে ঢাল বেয়ে নেমে এলাম পিচরাস্তায়। চৌরঙ্গী খাল এখনও কিছুটা বাকী। তবু বাস এসে গেলে এখান থেকেই উঠে পড়া যাবে।

পিছনে বাসের শব্দ। এসে গেল। হাত দেখিয়ে থামালাম। ড্রাইভার জানাল এর পরেও একটি বাস আছে। আমরা সে ঝুঁকি নিলাম না। চৌরঙ্গী খাল আসতে আমরা পণ্ডিতের হাতে ওর পাওনাটা দিয়ে দিলাম। ও বাড়ি যাবে। খিচুড়ির অর্ডার ছিল একটি দোকানে। তার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু টাকা দিলাম ওকে। বাস ছাড়বে, হঠাৎ কিছু পাহাড়ী মারমুখী হয়ে তেড়ে এল। তাদের দাবি, খিচুড়ি খেয়ে যেতে হবে। শুধুমুধু টাকা ওরা নেবে না। বাসের যাত্রী, চালক ও কনডাক্টর আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করল। আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোগ্রাসে কিছু খেয়ে কিছু নষ্ট করে বাসে উঠলাম। বাস ছাড়তেই বটব্যাল বলল, পথ হারালাম বলেই তো ভ্রমণটা স্মরণীয় হবে। অপূর্ব কটমট করে তাকাল।

ছবিঃ লেখক

# বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

## ধাতুভুক গাছ

গাছ কি খায়? তোমরা বলবে গাছ খায় জল আর জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ। এগুলো মূল দিয়ে শোষণ করে গাছ নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নেয়। খনিজ লবণগুলির মধ্যে বেশি মাত্রায় থাকা চাই নাইট্রোজেন, ফসফরাস আর পটাসিয়াম। এ ছাড়া সামান্য পরিমাণ লোহা, কোবল্ট, তামা ইত্যাদি ধাতু থাকলে ভালই হয়। কিন্তু ধাতব বস্তু গাছ বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে না। তাই যে সব মাটিতে কিছু কিছু ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকে সেখানে গাছ ভাল জন্মায় না। অন্যদিকে আমাদের বাঁচার জন্য ধাতব পদার্থের প্রয়োজন। কিন্তু নিকেল, সীসা ইত্যাদির মতো ধাতু যদি কোনোভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তাহলে সেগুলো শরীরে বিষক্রিয়া করে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও কালিয়াচকের ঘটনাটাই দেখ না, সেখানে আর্সেনিক মৌলটি জলের সঙ্গে মিশে মানুষের দেহে প্রবেশ করে তাদের কিভাবে অসুস্থ করে তুলেছে। নিশ্চয়ই তোমরা কাগজে পড়েছ। এইসব ধাতু ও বিষাক্ত মৌল যে সব জায়গার মাটিতে বেশি থাকে সেখানকার মাটি ও জলকে বিজ্ঞানীরা বলেন দূষিত মাটি ও জল। এই দূষণ ঠেকানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

সম্প্রতি ব্রাইটন ইনস্টিটিউটের আবাদী শস্যগবেষণা কেন্দ্রের ডঃ স্টিভেন ম্যাকগ্রাফ একটি সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি আবিষ্কার করেছেন একশ্রেণীর গাছ ঐ সব দূষিত জায়গায় ভাল জন্মায়। মাটি ও জল থেকে বিষাক্ত ধাতু ও মৌলগুলি সংগ্রহ করে এরা অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের দেহে সঞ্চিত করে রাখে। ফলে সে জায়গার জল ও মাটি দূষণমুক্ত হয়। এই গাছগুলি সপুষ্পক গুল্ম ও উদ্ভিদ দুরকমেরই হয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, নিউক্যালিডোনিয়ার মাটি নিকেল ও ক্রোমিয়ামের প্রাচুর্যের জন্য চাষের অযোগ্য ছিল। কিন্তু সেবারটিয়া অ্যাকুমিনেটা গাছ লাগানোর পর কয়েক বছরের মধ্যে সে জায়গার মাটি দূষণমুক্ত হয়ে আবাদী হয়েছে। এই গাছের শরীরে শতকরা এগার ভাগ নিকেল আর দশ ভাগ ক্রোমিয়াম সঞ্চিত থাকে। ফলে গাছটির বিভিন্ন প্রজাতি লাগিয়ে নানান রকম ধাতব-দূষণ রোধ করা যায়, উর্বর জমি তৈরি করা যায় এবং মানবজাতিকেও অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচানো যায়। ডঃ ম্যাকগ্রাফ আবেদন করেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় নিশ্চয় এরকম ধাতুভুক গাছ আরো আছে। সেগুলি খুঁজে বার করে তালিকাভুক্ত করা এক্ষুণি দরকার। তাহলে হয়তো নিকট ভবিষ্যতে আর্সেনিক দূষণের মতো ক্ষতির হাত থেকে আমরা বাঁচব।

## ক্যানসার সারাতে

ক্যানসার শব্দটা শুনলেই আমরা কেমন যেন হয়ে যাই। দেহের অস্বাভাবিক কোষকলা বৃদ্ধি বা টিউমারকেই সাধারণভাবে

ক্যানসার বলে। অবশ্য সব টিউমারই ক্যানসার নয়। ক্যানসারযুক্ত বা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের কোষগুলি দেহের অন্যান্য কোষ থেকে অসংলগ্ন আচরণ করে। তাদের জিনের গঠনে পার্থক্য দেখা যায়। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে কঠিন। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এক নতুন অস্ত্র। যার নাম আলফা-হিমোলাইসিন। পাওয়া গেছে স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস নামে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়ার দেহ থেকে। আলফা-হিমোলাইসিন এক ধরনের প্রোটিন অণু। এই প্রোটিনের ছটি অণু ক্যানসার আক্রান্ত টিউমারের কোষের উপর একটি ষড়ভুজ তৈরি করে। কিছুক্ষণ পরেই ষড়ভুজের কেন্দ্রে কোষের উপর একটি ছিদ্র হয়। কিভাবে এই ছিদ্র হয় সেটা এখনো বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেননি। এরপর ছিদ্রযুক্ত কোষটি মরে যায়। এভাবে ক্যানসারে আক্রান্ত জায়গার সব কোষ মরে ক্যানসার সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আরও আশার কথা, এই প্রোটিন ক্যানসার আক্রান্ত কোষ ছাড়া অন্য কোষকে ধ্বংস করে না। শরীরে এই প্রোটিন ইনজেক্ট করে ঢুকিয়ে দিলে নিজেই ক্যানসার আক্রান্ত কোষ খুঁজে নেয়। এই প্রোটিনটি মেটালো প্রোটিন জাতীয়।

# জিপসীদের দলে ম্যাম'জেল এক্স

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স তখন জার্মানির কবলে। কিন্তু দেশভক্তরা মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলে নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়ছে। এই ব্যাপারে ম্যাম'জেল ছিলো সবার ওপরে।

সেদিন বিকেলে ম্যাম'জেল এক্স নিনটিকে সঙ্গে নিয়ে এক ছোট্ট শহরের পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটারে আবার তাকে গান গাইতে হবে।

BLANCHARD WAXWORKS

JEWELLER'S SHOP

দ্যাখো, দ্যাখো—ওখানে কি হচ্ছে?

জার্মান পেট্রল—সকলকে সার্চ করছে। নিনটি শীগগির চলো ঐ মোমের পুতুল তৈরির করখানায় ঢুকে পড়ি। আমায় সার্চ করলেই কেলেঙ্কারি।

WAX

ম্যাম'জেল আর নিনটি কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মেরি অ্যানটনিয়েটের শরীরের মধ্যে আমি মাইক্রো ফিল্মটা লুকিয়ে রাখছি।

ম্যাম'জেল এগিয়ে গিয়ে জানলার লকটা খুলে দিলো।
কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে এই জানলা দিয়ে ঢুকে ফিল্মটা নিয়ে গেলেই হবে। এখন ওরা আমাদের তল্লাশ করে দেখতে পারে।
যা ভেবেছিলো তাই হলো। ওদের থামিয়ে দিলো নাৎসি সৈন্যরা।
কাগজপত্তর তো ঠিকই আছে। তবু তোমাদের সার্চ করতে হবে। সেইরকমই হুকুম।
ঠিক আছে, দেখুন না সার্চ করে।
ধন্যবাদ ক্ল্যারি। অন্যরা অবশ্য ব্যাপারটা এতো হাল্কাভাবে নেয় না। আজ রাত্তিরে আমি থিয়েটারে আসবো। সামনের সিটেই বসবো।
LANGE
আমি সম্মানিত বোধ করবো মঁসিয়ে ক্যাপ্টেন।
সন্ধ্যের পর ম্যাম'জেলের সাজঘরে....
এখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের দু একজন রাত্তিরে আমার কাছ থেকে মাইক্রো ফিল্মটা নিতে থিয়েটারে আসবে। আমি গান গাইতে শুরু করলে তুমি গিয়ে ওটা নিয়ে আসবে।
চিন্তা করো না ম্যাম'জেল। আমি এখনই যাচ্ছি। যথেষ্ট অন্ধকার এখন।
ঠিক তখনই.....
আরভিল ক্ল্যারি? ওঁকে আমি চিনি। সার্চ করার দরকার নেই। ভাবতেও পারি না উনি লুকিয়ে অস্ত্র পাচার করছেন।
বাঁচালেন ক্যাপ্টেন। আপনি সময়মতো না এলে ... তবে ওরা তো ওদের কাজই করছিলো।
নিনটি দ্রুত রাস্তা দিয়ে কারখানার পেছনে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।
কিসের শব্দ! ও বাতাস!
(চলবে)

# ভবিষ্যতের ঠিকানা

ডি. এ. চন্দ্রণ

## ডিপ্লোমা এঞ্জিনিয়ার

জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসে সফল হতে পারলে রাজ্যের যে কোনো এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হওয়া সম্ভব। তবে সবাই তো আর জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় সফল হতে পারে না, তাহলে তাদের ভাগ্যে কি আর এঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই উপায় আছে। এজন্য রাজ্যে ২৯টি পলিটেকনিক রয়েছে। যে কোনো একটি থেকে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ে এল.এম.ই, এল.সি.ই, এল.ই.ই ডিপ্লোমা লাভ করে ডিপ্লোমা এঞ্জিনিয়ার হওয়া যেতে পারে।

ডিপ্লোমা কোর্সে পাশ করার পর উচ্চশিক্ষা লাভেরও উপায় আছে। মোট কথা, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে না পারলে হতাশ হবার কারণ নেই—এভাবে বিকল্প পথে মনস্কামনা পূরণ করার অনেক রাস্তা খোলা আছে। এ. এম. আই. ই. কোর্স পাশ করেও এঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়। যাক্, এবারের আলোচনায় আমরা ডিপ্লোমা এঞ্জিনিয়ার সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করব।

ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্যও জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে হবে। দুটি জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষাই পরিচালনা করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব এগজামিনেশন ফর এঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ডিগ্রি কলেজেস, বি. ই. কলেজ ক্যাম্পাস, শিবপুর, হাওড়া-৩। তবে দুটি পরীক্ষা আলাদা। রাজ্যের বিভিন্ন পলিটেকনিকে ভর্তির জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

**শিক্ষাগত যোগ্যতা:** সাধারণত মাধ্যমিকে ইংরেজি, অঙ্ক ও ভৌত বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করলে পলিটেকনিকের জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসা যাবে। তবে প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ভর্তি বছরের ১লা জানুয়ারিতে অনূর্ধ্ব ২১। তফসিলি জাতি উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের ছাড় দেওয়া হয় তিন বছর। যদিও কাগজে কলমে নিয়ম আছে, মাধ্যমিক পাশ করলেই এই পরীক্ষায় বসা যায়, বাস্তবে কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বি.এস-সি পাঠরত অনেক ছাত্র এই পরীক্ষায় বসেন। ফলে প্রতিযোগিতা হয়ে ওঠে তীব্র। পলিটেকনিকে ভর্তি হওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

**ভর্তির নিয়মকানুন:** পলিটেকনিকের জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া হয় ডিসেম্বর মাস নাগাদ। এজন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যে কোনো পলিটেকনিক থেকেই ফর্ম সংগ্রহ করা যায়। ফর্ম পূরণ করে বিজ্ঞপ্তির নির্দেশমতো জমা দিতে হয় নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে। মার্চ মাস নাগাদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি পেপারের ওপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। ম্যাথমেটিকস, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি। ম্যাথমেটিকসে থাকে ১০০ নম্বর, ফিজিক্সে থাকে ৫০ নম্বর ও কেমিস্ট্রিতে থাকে ৫০ নম্বর। একই দিনে তিনটি পেপারের পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রশ্ন করা হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নের মান বজায় রেখে। সাবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই প্রশ্ন করা হয়। ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পেপারে ২০ থেকে ২৫টি প্রশ্ন করা হয়। সব প্রশ্নেরই উত্তর লিখতে হয়। তিনটি পেপারে আলাদা আলাদা ভাবে পাশ করতে হয়। কোনো পেপারে কম নম্বর পেয়ে অন্য পেপারে ভাল নম্বর পেলে চলবে না। সব পেপারেই কোয়ালিফাইং নম্বর পেতে হবে। তিনটি পেপারে পাওয়া মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট লিস্ট তৈরি করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম পাঁচ হাজার জনের নাম মেরিট লিস্টে রাখা হয়। বিভিন্ন পলিটেকনিকে সিট আছে ২৯৭৫টি। মেরিট লিস্ট বিভিন্ন পলিটেকনিকে জুন মাস নাগাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের ফলাফল মিলিয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। ইন্টারভিউ নেন সেন্ট্রাল সিলেকশন কমিটি।

**বিভিন্ন পলিটেকনিক:** এবার রাজ্যের কোথায় কোন পলিটেকনিক আছে এবং সেখানে কোন বিষয়ে কটা সিট আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি—(১) এ. পি. সি. রায় পলিটেকনিক, যাদবপুর, কলকাতা-৩২। পড়ানো হয় সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল শাখায়। সিট আছে যথাক্রমে ৬০, ৪০ ও ৬০টি (২) সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক, ২১ কনভেন্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। পড়ানো হয় ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন। সিট আছে ৩০, ৬০ ও ৩০টি (৩) নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিক, ১৫ গোবিন্দ মণ্ডল লেন, কলকাতা-৭০০০০২। পড়ানো হয় সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেট্রিক্যাল কোর্স। সিট আছে যথাক্রমে ৬০, ৬০ ও ৪০টি (৪) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক, ৭ ময়ূরভঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০০২৩। সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে সিট আছে ৬০, ৬০ ও ৪০টি (৫) রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজি, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০৩২। পড়ানো হয় লিথোগ্রাফি, লেটারপ্রেস, কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি। সিট আছে ১৭, ১০ ও ৩টি (৬) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া-৭১১২০২। সিট আছে সিভিলে ৬০টি, মেকানিক্যালে ৪০টি ও ইলেকট্রিক্যালে ৪০টি (৭) উওমেন্স পলিটেকনিক, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮। পড়ানো হয় দুটি বিষয়ে: ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। সিট আছে ৩০টি করে। (৮) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬। সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল কোর্সে সিট আছে ৬০, ৪০ ও ৬০টি (৯) হুগলী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, হুগলী। সিভিল, মেকানিক্যাল,

ইলেকট্রিক্যাল তিনটি কোর্সে সিট আছে যথাক্রমে ৬০, ৬০ ও ৪০টি (১০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পলিটেকনিক, ঝাড়গ্রাম, সেবায়তন, মেদিনীপুর-৭২১৫১৪। সিভিল ৬০, মেকানিক্যাল ৬০, ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে ৪০টি সিট আছে। (১১) কন্যাপুর পলিটেকনিক, কন্যাপুর, আসানসোল, বর্ধমান। সিট আছে ইলেকট্রিক্যালে ৪০টি ও মেকানিক্যালে ৬০টি (১২) আসানসোল পলিটেকনিক, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল। পড়ানো হয় মেটালার্জি কোর্স। সিট আছে ১৫টি (১৩) বি. পি. সি. ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া। সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যালে যথাক্রমে ৬০, ৪০ ও ৬০টি সিট আছে (১৪) জগদীশচন্দ্র পলিটেকনিক, বেড়াচাঁপা, দেবালয়, উত্তর ২৪ পরগনা। সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল তিনটি কোর্সেই ৪০টি করে সিট আছে (১৫) কে. জি. এঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। সিভিল ও মেকানিক্যালে সিট আছে ৬০টি করে এবং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে ৪০টি (১৬) এম. বি. সি. ইনস্টিটিউট অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বর্ধমান। সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের জন্য আছে ৬০, ৬০ ও ৪০টি সিট (১৭) পুরুলিয়া পলিটেকনিক, বিবেকানন্দ নগর, পুরুলিয়া। সিট আছে সিভিলে ৬০টি, মেকানিক্যালে ৪০টি, ইলেকট্রিক্যালে ২০টি (১৮) কোচবিহার পলিটেকনিক, কোচবিহার। তিনটি কোর্সই পড়ানো হয়। সিট আছে ৩০টি করে (১৯) দার্জিলিং পলিটেকনিক, কার্শিয়াং, দার্জিলিং। সিভিল কোর্সে ৬০টি সিট আছে (২০) মালদা পলিটেকনিক, মালিহা, মালদা। তিনটি কোর্সেই পড়ার সুযোগ আছে। সিভিলে ৬০টি ও অন্য দুটি কোর্সে সিট আছে ৩০টি করে (২১) মুর্শিদাবাদ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কাশিমবাজার রাজ, মুর্শিদাবাদ। পড়ানো হয় সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল। সিট আছে যথাক্রমে ৪০, ৫০ ও ৩০টি (২২) শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ, সিউড়ি, বীরভূম। সিভিলে ৬০টি, মেকানিক্যালে ৬০টি ও ইলেকট্রিক্যালে ৪০টি সিট আছে (২৩) জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক, ভাঙ্গুয়াঝাড়, জলপাইগুড়ি। সিভিলে ৬০টি, মেকানিক্যালে ৬০টি ও ইলেকট্রিক্যালে ৪০টি সিট আছে (২৪) রায়গঞ্জ পলিটেকনিক, রায়গঞ্জ, জেলা পশ্চিম দিনাজপুর। সিভিলে ৩০টি সিট আছে (২৫) বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ৫৬ বি. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫০ (২৬) ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট পোঃ ব্যান্ডেল, হুগলী-৭১২১২৩ (২৭) কন্টাই পলিটেকনিক, পোঃ কন্টাই, মেদিনীপুর-৭২১৪০১ (২৮) ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল, ১১০ এস. এন. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ (২৯) এঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ফর জুনিয়র এক্সিকিউটিভস, দালালপুকুর, হাওড়া-৭১১১০৪।

**ইন্টারভিউঃ** সবকটি পলিটেকনিকে ভর্তির জন্য পলিটেকনিকগুলোকে ভাগ করে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। কোচবিহার পলিটেকনিক, দার্জিলিং পলিটেকনিক, মালদা পলিটেকনিক, মুর্শিদাবাদ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ (সিউড়ি), জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক এবং রায়গঞ্জ পলিটেকনিকে ভর্তির জন্য ইন্টারভিউ নেন স্ট্রেট সিলেকশন কমিটি-২। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও উত্তরবঙ্গের প্রার্থীরা এই সাতটি পলিটেকনিকে ভর্তির সুযোগ পাবেন। ইন্টারভিউ নেওয়া হয় মালদায়। প্রথম সতেরোটি পলিটেকনিকে ভর্তির জন্য ইন্টারভিউ নেন স্ট্রেট সিলেকশন কমিটি-১। এই সব পলিটেকনিকে ভর্তির ইন্টারভিউ নেওয়া হয় সাধারণতঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিকে। হাওড়ার ইনস্টিটিউট ফর জুনিয়র এক্সিকিউটিভস মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্যান্ডউইচ কোর্স পড়ানো হয়। আগে অঙ্ক ও বিজ্ঞানে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করলে এই কোর্সে ভর্তির আবেদন করা যেত। এখন জয়েন্ট এনট্রান্সের মাধ্যমেই ছাত্র ভর্তি করা হয়।

**গুরুত্বঃ** ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগে বিভিন্ন টেকনিক্যাল পোস্টে লোক নেওয়ার সময় ডিপ্লোমা এঞ্জিনিয়ারদের সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া বিমান বাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, দূরদর্শন, আকাশবাণী প্রভৃতি সংস্থায় ওভারসিয়ার, সুপারভাইজার, এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করা হয়। এই কোর্সে পাশ করার পর এ.এম.আই.ই. কোর্স করতে পারেন। উচ্চশিক্ষারও সুযোগ পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করে ভবিষ্যত তৈরির অনেক পথই খোলা আছে। চাকরি, উচ্চশিক্ষার সুযোগ সবই সম্ভব!


অনুবাদ সিরিজ

অনুবাদ সিরিজের আরও ক'য়েকটি বই

কাউন্টেস দ্য চার্নি
দ্য কনস্পিরেটর্স
দি বটল ইম্প
দি ম্যান হু লাফ্‌স
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লডস
দি লাস্ট অব দি মহিক্যানস
এ কানেক্টিকাট ইয়্যাংকি ইন্ কিং আর্থার্স কোর্ট

এ্যাডভেঞ্চারস অব মার্কো পোলো
ট্যু ইয়ার্স বিফোর দ্য মাস্ট
ফোর্ট্রেস ইন দ্য ফোর্থ
দ্য ফোর জাস্ট মেন্

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

# ডাকহরকরার কাহিনী

## অরুণকুমার সেনগুপ্ত

প্রাচীনকাল থেকে ডাকহরকরারা ডাকের চিঠি বিলি করে আসছেন। এই কাজে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাঁরা চিঠি বিলি করেছেন। মরু অঞ্চলে উটের পিঠে চড়ে ডাকের চিঠিপ্রাপকের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দিয়েছেন। কোনো সময়ে ডাক বিলি করতে হাতির পিঠে চড়তেও তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। তুষারে ঢাকা অঞ্চলে তাঁরা ব্যবহার করেছেন স্লেজ গাড়ি। এমনকি জীবন বিপন্ন করে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য পার হয়েও তাঁরা চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন।

বর্তমানকালে আলাসকাতে কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে চড়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে চিঠি বিলি করেন ডাকহরকরারা। উনিশ শতকে ইংলন্ডের সারে অঞ্চলেও কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে ডাকহরকরারা চিঠি বিলি করতেন।

১৮৮০ সালে ইংলন্ডে ডাকহরকরারা বাই-সাইকেলে চেপে ডাকের চিঠি বিলি করবার কাজ শুরু করেন। এরপর তাঁরা ব্যবহার করেন চার চাকার সাইকেল। সুইজারল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়াতে, ইটালীতে ডাকহরকরারা বাই-সাইকেলে চড়েই চিঠি বিলি করে থাকেন।

প্রথমে ডাকহরকরাদের কাছে ডাকটিকিট কিনতে পাওয়া যেত। চিঠি বিলি করতে বেরুলে তাঁরা ডাকটিকিট সঙ্গে রাখতেন। ডাকঘরে গিয়ে ডাকটিকিট কিনতে হতো না।

পৃথিবীতে যখন কোথাও ডাকঘর চালু হয়নি, যখন ডাকে চিঠি বিলি করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না, তখন রাজা ও ধনী ব্যবসায়ীরা নিজেদের চিঠি পাঠাবার জন্যে পত্রবাহক নিযুক্ত করতেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস এইসব পত্রবাহকদের নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, এইসব পত্রবাহকদের নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না। তাঁরা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে দুর্গম পথ অতিক্রম করে চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন।

ডাকহরকরাকে সাঁতার কেটে চিঠি সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে। দ্বীপের নাম সেন্ট কিলডা। স্কটল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে এই দ্বীপ। ১৮৭৬ সালে এখানে প্রথম ডাক চালু হয়। কাঠের নৌকোয় চড়ে ডাকহরকরারা দ্বীপ থেকে চিঠি সংগ্রহ করতে যেতেন। দ্বীপের ধারে একখানা টিনের বাক্সয় চিঠি রেখে দেওয়া হতো। এইসব চিঠি বিলি করার ব্যবস্থাকে বলা হতো টিনক্যান মেল। ১৯২১ সালে দক্ষ সাঁতারুদের এই দ্বীপে ডাকহরকরা পদে নিযুক্ত করা হয়। দ্বীপে চিঠি সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন ডাকহরকরা হাঙরের মুখে নিহত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডাকহরকরারা প্যারাসুটে করে দুর্গম অঞ্চলে নেমে চিঠি বিলি করেছেন। বোর্নিওর জঙ্গলে সৈন্যদের চিঠিপত্র আর প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে টোকিলার্ড দ্বীপের অধিবাসীদের চিঠি তাঁরা এইভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখ আছে ইসরায়েলে এক রাজা আর এক রাজার কাছে ডাকহরকরা মারফত চিঠি পাঠাতেন। যীশুখ্রীস্ট জন্ম নেওয়ার ছশো বছর আগে পারস্যের রাজা সাইরাস তাঁর দেশে ডাকব্যবস্থা চালু করেছিলেন। ডাকহরকরাদের দায়িত্ব ছিল অনেক। তাঁরা গোপনীয়, গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র বিলি করতেন। তাঁরা বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতেন। অনেক সময় তাঁদের শত্রুদেশের মধ্যে দিয়েও যেতে হতো।

সাত শতকে আরব দেশে ছটি রুটে ডাক বিলি করবার ব্যবস্থা হয়। এই ছটি রুটে এক হাজার ডাককেন্দ্র খোলা হয়। গড়ে প্রতি বারো মাইল অন্তর ডাককেন্দ্র খোলা হয়। ডাকহরকরারা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতেন। এছাড়া ডাকহরকরারা সাধারণ চিঠি পায়ে হেঁটে, অনেক সময় উটের পিঠে চড়ে বিলি করে দিতেন।

ছবিঃ প্রসাদ রায়

# আজহারের লকেট

তৃষিত বর্মন

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই রাজর্ষির বাবা হইচই শুরু করে দিলেন। রাজর্ষি ওরফে বুমবা সবে তখন পড়ার টেবিলে গুছিয়ে বসেছে। বাবার গলা পেয়ে মায়ের সঙ্গে সেও বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল।

জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বুমবার দিকে তাকিয়ে সুদর্শনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'তোর বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির ফাইন্যাল কবে যেন?'

বুমবা বললো—'আঠারই ডিসেম্বর। ইডেন গার্ডেনস-এ।'

গলার টাইটা আলগা করে সুদর্শনবাবু বুমবার মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন—'তাহলে তো ঠিক আছে।'

বুমবার মা বিরক্ত হলেন। বললেন—'তখন থেকে তো খালি রহস্য করে চলেছ। কি ঠিক আছে, সেটা বলবে তো? আমার তাড়া আছে।'

সুদর্শনবাবু ব্রিফকেস খুলে কমপিউটারাইজড একটা রেলের টিকিট দুজনের মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন—'কুড়ি তারিখে বুমবার খেলা শেষ হবে। আমরা বাইশে দার্জিলিং মেলে রওনা হচ্ছি। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বল তো?'

বুমবার মা আঁতকে উঠে বললেন—'রক্ষে করো, এই ডিসেম্বরের শীতে কেউ দার্জিলিং যায় নাকি? জমে বরফ হয়ে যাব সবাই।'

সুদর্শনবাবু হাসলেন। বললেন—'এটাই তোমাদের ভুল ধারণা। শীতেই তো দার্জিলিং-এ মজা। হোটেলগুলো ফাঁকা থাকবে। ম্যালেতে ট্যুরিস্টদের থিকথিকে ভিড় থাকবে না। মরশুমী ফুলে ঝলমল করবে দার্জিলিং-এর রাস্তাঘাট। তাছাড়া এনজয় করতে হলে শীতকালেই শীতের দেশে যেতে হয়। গরম জামাকাপড় একটু বেশি লাগবে, এই যা।'

টানটান উত্তেজনার মধ্যে দেখতে দেখতে আঠার তারিখ এসে গেল। পৃথিবীর বহু বরেণ্য খেলোয়াড়ের অনবদ্য খেলার সাক্ষী ইডেন গার্ডেনস, যে কোনো খেলোয়াড়ের কাছে স্বপ্নপুরী। সেখানেই বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির ফাইন্যালে পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলের মুখোমুখি হচ্ছে। ষোল বছরের রাজর্ষি চৌধুরী পূর্বাঞ্চলের বড় ভরসা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেমি-ফাইন্যালে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে করা তার বিরাশি রানের ঝকঝকে ইনিংসটা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। উইকেটের কাছাকাছি তুখোড় ফিল্ডার হিসেবে ইতিমধ্যেই সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। গালি এবং পয়েন্ট অঞ্চলেই ফিডিং করতে বেশি পছন্দ করে রাজর্ষি। এ ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক আজহারউদ্দিনকে সে মনে মনে গুরু বলে মানে। তার ভীষণ ইচ্ছে, মুখোমুখি দেখা হলে সে গুরুর কাছ থেকে কিছু টিপস চেয়ে নেবে।

বুমবার খেলা থাকলে ওর মা সাধারণত মাঠে যেতে চান না। এবারে ইডেনে, তায় ফাইন্যাল খেলা বলে সুদর্শনবাবু চাপাচাপি করাতে বললেন—'না বাপু, এই বয়সে অত টেনশন আমার সহ্য হবে না। তোমরা যাও।' সুদর্শনবাবু দিন তিনেক ছুটি নিয়েছেন। ছেলের খেলা থাকলে হাজার কাজ ফেলেও উনি ঠিক মাঠে হাজির থাকবেন।

সমাঝদার ক্রিকেট দর্শক হিসেবে কলকাতার নাকি সুনাম আছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, টেস্ট ম্যাচ ছাড়া মাঝারি ধরনের খেলায় নামমাত্র দর্শক আসে ঐতিহাসিক ইডেনে। কিন্তু ফাইন্যালের এই দুটি দলে বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিবান ক্রিকেটার আছে, যারা নাকি ভারতীয় দলে একদিন নিশ্চিত জায়গা করে নেবে।

পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যান রাজর্ষি চৌধুরী, সৌরভ মিত্র, পশ্চিমাঞ্চলের মিডিয়াম পেসার রাহুল কানিতকার, ব্যাটসম্যান শচীন যোগলেকার, লেপ স্পিন গুগলি বোলার সুশীল আপ্তের ওপর নির্বাচকদের আলাদা নজর আছে। বহুদিন ভারতীয় ক্রিকেট দলে পূর্বাঞ্চলের কোনো প্রতিনিধি নেই। তাই আগামী দিনের এইসব ক্ষুদে প্রতিনিধিদের উৎসাহ দিতে কলকাতার মানুষ সেদিন ভিড় করে এল ইডেন গার্ডেনস-এ।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিল পূর্বাঞ্চল। প্রথম ইনিংসে বেশি রান তুলে নিতে পারলে বিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু আর একজন বোধহয় অন্যরকম ভেবেছিল। ভারী আবহাওয়ায় ইডেনের প্রথম সকালটা যে কোনো পেস বোলারের কাছে স্বপ্ন। হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে দীর্ঘকায় রাহুল কানিতকার যেন আগুন ছড়াতে শুরু করল। তার প্রথম ওভারের চতুর্থ বলটাই লেগ-মিডে পড়ে অনেকটা আউট-স্যুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেব কি দেব না করে ব্যাটটা বাড়িয়ে দিল সৌরভ। থার্ড স্লিপে সহজ ক্যাচ । পূর্বাঞ্চল শূন্য রানে এক উইকেট। পরের এক ঘণ্টায় কানিতকারের নিয়ন্ত্রিত স্যুইংয়ের কাছে পূর্বাঞ্চলের চার চারজন ব্যাটসম্যান অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করল। সমস্ত ইডেন অবাক হয়ে দেখল, কেন রাহুল কানিতকারকে আগামী দিনে কপিলদেবের সার্থক উত্তরসূরী বলা হয়।

পঞ্চম উইকেটে রাজর্ষি যখন ব্যাট করতে নামল, পূর্বাঞ্চল তখন রীতিমত ধুঁকছে। চার উইকেটে সাকুল্যে মোটে একান্ন রান। ক্রিজে এসে রাজর্ষি প্রথমেই নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান সঞ্জয়ের কাছে এগিয়ে গেল। বললো—'এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে উইকেট দেওয়ার কোনো মানে নেই। মারের বদলা মার দিতে হবে। তুই শুধু ডিফেন্স করে যা।'

এর পর সারা ইডেন সবিস্ময়ে দেখল, রাহুল কানিতকারের উদ্যত ফণা, সুশীল আপ্তের বিষাক্ত স্পিনের ছোবলগলো কেমন করে এক কিশোরের প্রচণ্ড বিক্রমের কাছে আস্তে আস্তে গুটিয়ে যাচ্ছে। লাল টুকটুকে বলটা আগুনের গোলার মতো ইডেনের সবুজ ঘাসের বুক চিরে বারবার আছড়ে গিয়ে পড়ছে বাউন্ডারীর ফেন্সিং-এ। বার তিনেক তো অনায়াসদক্ষতায় মিড উইকেট আর লং অনের মাথার ওপর দিয়ে তুলে ফেলল দর্শক গ্যালারীতে। দিনের শেষে উপস্থিত হাজার পনেরো দর্শকের তুমুল করতালির মধ্যে দিয়ে ব্যাট উঁচু করে রাজর্ষি যখন প্যাভেলিয়নে ফিরছে তখন তার নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে একশ বারো রানের অপরাজিত অঙ্কটা। পূর্বাঞ্চল আট উইকেটে দুশো একানব্বই। পরের দিন লাঞ্চের একঘণ্টা আগেই পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল তিন শ' সতেরো রানে। রাজর্ষি একশ উনত্রিশ রানে অপরাজিত।

পশ্চিমাঞ্চল শুরুটা করল খুব সতর্কতায়। প্রথম জুটি অবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রহ করল বাষট্টি রান। গ্যালারীতে উত্তেজনা বাড়ছে। দর্শকেরা চাইছে ঘনঘন উইকেট পড়ুক। কিন্তু খেলাটা ক্রিকেট। এখনও ভারতীয় ক্রিকেটের পীঠস্থান বলতে পশ্চিমাঞ্চলকেই বোঝায়। অনেক বরেণ্য খেলোয়াড়ের জন্ম দিয়েছে ওরা। তা বলে পূর্বাঞ্চল কি চিরকাল উপেক্ষিতই থাকবে? এইসব তরুণ ছেলেদের ঘিরে দর্শকের প্রত্যাশা আকাশ ছুঁয়েছে। স্বভাবতই তাঁরা চাইছেন বিপক্ষের উদ্ধত মাথা ভূলুণ্ঠিত করে ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনস-এ পূর্বাঞ্চলের ছেলেরা নতুন ইতিহাস গড়ুক।

অধিনায়ক বিক্রম মহান্তির কপালে বাড়তি কিছু ভাঁজ দেখা গেল। সহখেলোয়াড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে সে অনিয়মিত বোলার কৌশিক সেনের হাতে বল তুলে দিল। আর কি আশ্চর্য! ক্লাব হাউস প্রান্ত থেকে তার প্রথম ওভারেই বহু প্রত্যাশিত ব্রেক-থ্রুটা পূর্বাঞ্চলকে পাইয়ে দিল কৌশিক। পরপর আরও তিনটে উইকেট পড়ল পশ্চিমাঞ্চলের অল্প ব্যবধানে। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে ভারতের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান ব্যাটস্‌ম্যান শচীন যোগলেকার আর অজয় প্যাটেল অবিচ্ছিন্ন একশ' একষট্টি রান যোগ করে দ্বিতীয় দিনের শেষে পশ্চিমাঞ্চলকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। একরাশ উদ্বেগ নিয়ে ইডেনের দর্শকেরা যখন মাঠ ছেড়ে যাচ্ছিলেন, পশ্চিমাঞ্চলের রান তখন পাঁচ উইকেটে দুশো একচল্লিশ।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে কিছুই খেতে পারল না বুমবা। সুদর্শনবাবু ছেলেকে উৎসাহ দিলেন। বললেন—'তুই অত ভেঙে পড়ছিস কেন? ক্রিকেটে শেষ বলটা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না। কাল সকালের ফার্স্ট আওয়ারটাই খুব ভাইটাল। থিতু হওয়ার আগেই ঐ জুটি তোদের ভাঙতে হবে।'

তৃতীয় দিন ইডেনের ক্লাব হাউস কানায় কানায় পূর্ণ। সরাসরি জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। তাই, প্রথম ইনিংসের ফলাফলে যে দল এগিয়ে যাবে, তারাই এ বছর 'বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি' নিজেদের দখলে রাখবে। পূর্বাঞ্চলের রান টপকে যেতে পশ্চিমাঞ্চলের মাত্র সাতাত্তর রানের প্রয়োজন। হাতে জলজ্যান্ত পাঁচ পাঁচটি উইকেট।

দাঁতে দাঁত চেপে পূর্বাঞ্চলের এগারজন মাঠে নামল সংকল্পে কঠোর হয়ে। হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে বোলিং শুরু করল বাঁ-হাতি বোলার সাগর দাশশর্মা। সামনে অজয় প্যাটেল সাতষট্টি রানে অপরাজিত। প্রথম এবং দ্বিতীয় বল অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে পড়ে আরও বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বলের ওপর চোখ রেখে প্যাটেল খেলবার কোনো চেষ্টাই করল না। তৃতীয় বলটা একটু ঠুকে দিল সাগর। বাঁ-হাতি বোলারের ইন কামিং ডেলিভারী বুক-সমান লাফিয়ে উঠতে সরবার কোনো ফুরসত পেল না অজয়। ব্যাটের ওপরের কানায় লেগে বল উড়ে গেল গালি অঞ্চলে। শিকারী চিতার মতো সেখানে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল রাজর্ষি। বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় মাটির ইঞ্চিখানেক ওপর থেকে ক্যাচটা লুফে নিল সে। আকাশে

বলটা ছুঁড়ে দিয়ে গলার লকেটটা বারবার চুম্বন করল রাজর্ষি। এতে তার গুরুর ছবি আছে। বল ছোঁড়ার ভঙ্গিটা যেন সেই রকমই হলো। ততক্ষণে দশজন সতীর্থ ওকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দনের উষ্ণতায় ভরিয়ে দিচ্ছে।

পরের ওভারে ক্লাব হাউস প্রান্ত থেকে বল করতে এল রাজীব গাঙ্গুলি। স্লো মিডিয়াম পেসার। শচীন দু রানের বেশি সংগ্রহ করতে পারল না। পরের ওভারে সদ্য ক্রিজে আসা ময়ূর খণ্ডকার সাগরকে মেডেন ওভার দিল। রাজীবের পরের ওভারের দ্বিতীয় বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে শর্ট পিচ ডেলিভারী। বাঁ পা পেছনে এনে সজোরে স্কোয়ার কাট করল শচীন যোগলেকার। বিদ্যুৎগতিতে বল ছুটে যাচ্ছিল বাউন্ডারীর দিকে। কিন্তু অসাধারণ অনুমান ক্ষমতায় ডান দিকে ঝাঁপিয়ে শুয়ে পড়ে বলটা আটকে দিল রাজর্ষি। গ্যালারীতে তুমুল হর্ষধ্বনি। এক রান নিয়ে শচীন প্রান্ত বদল করল। রাজীবের পরের বল গুড লেংথ। বাঁ পা বাড়িয়ে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলতে গেল ময়ূর খণ্ডকার। ব্যাটস্‌ম্যান যা অনুমান করেছিল, তার থেকে অনেক আস্তে এল বল। বাড়ানো ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বল সোজা গিয়ে আশ্রয় নিল উইকেট-কিপার অরণ্য সেনের বিশ্বস্ত গ্লাভসে।

খেলা শুরুর আধঘন্টার মধ্যেই পশ্চিমাঞ্চল সাত উইকেট হারিয়ে বসল মাত্র দুশো বাহান্ন রানে। অষ্টম উইকেটে আবার খেলাটাকে ধরে নিল শচীনের সঙ্গী সেই মিডিয়াম পেসার রাহুল কানিতকার। বেশির ভাগ পেস বোলারের মতো সেও বলকে সজোরে পেটাতে ভালবাসে। শচীন ধীরে ধীরে তার প্রত্যাশিত শত রানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে পশ্চিমাঞ্চলের রান দাঁড়াল সাত উইকেটে দুশো চুরানব্বই। শচীন যোগলেকার আটানব্বই এবং রাহুল কানিতকার একত্রিশ রানে অপরাজিত। ইডেন গার্ডেনস-এ উপস্থিত দর্শকদের একরাশ উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রেখে বিক্রম মহান্তির দল লাঞ্চ খেতে গেল।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর খেলা শুরু হতে ইডেনের দর্শকেরা অবাক হয়ে দেখল অধিনায়ক বিক্রম মহান্তি হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে সেই অনিয়মিত বোলার কৌশিক সেনের হাতে বল তুলে দিচ্ছে। সমস্ত প্যাভেলিয়ন হায় হায় করে উঠল। রাহুল কানিতকার তো তুলোধনা করে ছাড়বে কৌশিকের নির্বিষ অফ স্পিনগুলোকে। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো জিভটা বোধ করি একবার অজান্তে চেটে নিল রাহুল।

প্রথম বলটা একটু ওভারপিচ ধরনের। মিড উইকেটে পুস করে দু রান সংগ্রহ করে নিল কানিতকার। পরের বল অনেকটা ঝুলিয়ে দিল কৌশিক। রাহুল ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সোজা বল তুলে দিল লং অনের ওপর দিয়ে। এই ভুলটুকুর জন্য লং অন বাউন্ডারীতে দড়ি ছুঁয়ে অপেক্ষা করছিল বিক্রম মহান্তি স্বয়ং। কিন্তু সেটা যে প্রথম ওভারেই আসবে, সে নিজেও ভাবেনি। পনেরো গজ দৌড়ে অসাধারণ তৎপরতায় ক্যাচটা লুফে নিল সে। সারা ইডেন তখন উত্তেজনায় ফুটছে। চরম হতাশায়, নিজের ওপর ধিক্কারে মাটিতে ব্যাট ঠুকতে ঠুকতে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল কানিতকার।

এইসব দেখে শচীনের তরুণ রক্ত বোধহয় একটু নাড়া খেল। আক্রমণকে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট নীতি করে পরের ওভারে পরপর তিনটে ক্লাসিক বাউন্ডারীর সাহায্যে সে পৌঁছে গেল একশ দশ রানে। আর সমস্ত ইডেনের দর্শককে জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেটে আগামী দিনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হতে চলেছে। পশ্চিমাঞ্চলের রান গিয়ে দাঁড়াল আট উইকেটে তিনশ নয়। কৌশিকের পরের ওভারের চতুর্থ বলটা শর্টপীচ পড়তেই সজোরে পুল করে নতুন ব্যাটসম্যান মোহন আগাসে সেটা পত্রপাঠ বাউন্ডারীতে পাঠিয়ে দিল। আর মাত্র পাঁচ রান। হাতে দুটো উইকেট পশ্চিমাঞ্চলের। খুবই সহজ কাজ, যেখানে শচীন এখনও ক্রিজে।

উত্তেজনায় ক্লাব হাউসে নিজের নির্দিষ্ট সীটে বসে থাকতে পারছিলেন না সুদর্শনবাবু। বারবার তাঁর মনে হচ্ছিল, দার্জিলিংয়ের প্রোগ্রামটা এখন না করলেই হতো।

পরের ওভার শুরু হওয়ার আগে বিক্রম মহান্তি সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে ছোটখাটো একটা শলাপরামর্শ করে বল


মুখোপাধ্যায় • মান্না • দত্ত

**উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান**

(হায়ার সেকেণ্ডারী • জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স • সর্বভারতীয় বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়

**বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস**

(প্রশ্নোত্তরে)

সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে সত্বর লিখুন

**নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ**

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

তুলে দিল বাঁ-হাতি বোলার সাগর দাশশর্মার হাতে। প্রথম দুটো বলে কোনো রান হলো না। তৃতীয় বলটা ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপের মাঝ দিয়ে চলে গেল থার্ডম্যান অঞ্চলে, বল ফেরত আসার আগেই দ্রুত দুটো রান কুড়িয়ে নিল মোহন আগাসে। আর মাত্র তিন রান করলেই 'বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি' জিতে যাবে পশ্চিমাঞ্চল। বাঁ-হাতি সাগরের পঞ্চম বলটা ডান হাতি আগাসের ইনকামিং ডেলিভারি। গুড লেংথে পড়ে দ্রুত বলটা ঢুকে এল ভেতরে। ব্যাট নামাবার সময় পেল না মোহন। বল প্যাডে লাগতেই আবেদন। আর সঙ্গে সঙ্গেই আম্পায়ার রাঠোরের হাত উঠে গেল আকাশে। সারা ইডেন জুড়ে করতালির মধ্যে ওভার শেষ করল সাগর।

শেষ ব্যাটস্‌ম্যান সুশীল আপ্তে ক্রিজে আসতে ওর দিকে এগিয়ে গেল শচীন। পিচের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে কিছু পরামর্শ দিল। ব্যাট করবে সে নিজে। জয়-পরাজয়ের মাঝে মাত্র তিন রানের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সমস্ত ইডেন উত্তেজনায় ফুটছে।

ক্লাব হাউস প্রান্ত থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওভারটা করতে এল রাজীব গাঙ্গুলি। প্রথম বলটা ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলল শচীন। কোনো রান হলো না। পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়রা জেনে গেছে যে এক রান নিয়ে শচীন যোগলেকার শেষ ব্যাটস্‌ম্যান সুশীল আপ্তেকে কোনোমতেই রাজীব গাঙ্গুলির বোলিংয়ের সামনে আনবে না। কমপক্ষে দু রান ওর চাই-ই।

দ্বিতীয় বলটাও একই ভঙ্গিতে খেলল সে। এবারে মারে একটু জোর ছিল। বল চলে গেল মিড-অন অঞ্চলে। ছুটলে এক রান অনায়াসে হতে পারত। কিন্তু ব্যাটস্‌ম্যান রান নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করল না। তৃতীয় বল অফ স্টাম্পের ওপর। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সজোরে কাট করল শচীন যোগলেকার। ইডেনের দর্শকেরা সভয়ে চোখ বুঁজলো। অব্যর্থ বাউন্ডারী। কিন্তু গালি অঞ্চল থেকে মরিয়া একটা ছায়া হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল ছুটন্ত বলটাকে লক্ষ্য করে। আর তার পরই ইডেন গার্ডেনস-এ উপস্থিত পনেরো হাজার দর্শক সবিস্ময়ে দেখল, বোলার প্রান্তের উইকেট ভেঙে গেছে অব্যর্থ নিশানায়। শচীন যোগলেকার তখনও ক্রিজের এক হাত বাইরে।

মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই বারবার লকেটটা চুম্বন করছিল রাজর্ষি। সতীর্থদের আদরে আদরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওর। লজ্জায় সে কাউকে বলতে পারল না, লকেটের ভেতরে রাখা তার আরাধ্য গুরুই যেন সেই মুহূর্তে রাজর্ষি চৌধুরী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছুটন্ত বলটার ওপর।

ইডেনে প্যাগোডার পেছনে সেদিনের রক্তলাল সূর্যটা হারিয়ে গেল আগামী দিনের এক নতুন, উজ্জ্বল সকালের প্রত্যাশায়।



ছবিঃ ধ্রুব রায়


# DICTIONARIES

BY

A. T. DEV

(English—Bengali)

(Bengali—English)

অভিধান

(Bengali—Bengali)

Students' Favourite Dictionary
Dev's Concise Dictionary
Pocket Dictionary
Midget Dictionary

শব্দবোধ অভিধান
নূতন বাংলা অভিধান
সরল অভিধান (পরিবর্ধিত সংস্করণ)

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

## নতুন ধাঁধা

১। কালের অন্ত নাই
শেষে দেখ পৃথিবী
আপনজন সবারই তিনি
কোন সেই গুণী ?

সুনীল সাহা
বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২

২। স্বর্গ কোথায় জানতে চাও ?
চোখের নিচে স্বর্গ পাও।

সত্যবান মণ্ডল
সাগরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

৩। আগা কাটবে যদি
জল গড়াবে তাতে
পেট কাটবে যদি
জল ভরবে তাতে।

মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস
নুড়িপাড়া, কৃষ্ণনগর

৪। দেবী এবং দেব
দেখি পাশাপাশি বসে
লেখকমশাই তাঁর
কলম চালাতেন কষে।

সুহাসকুমার ভট্টাচার্য ভাটপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা।

---

**নতুন শব্দমালা ঃ**

**সূত্র ঃ**

**পাশাপাশি ঃ**

১। বারমুডা (মধ্য আমেরিকা) রাষ্ট্রের রাজধানী।
৬। আরব দেশে প্রচলিত মুদ্রা।
৭। ব্যবসায়ীর পদবি।
৮। রবিঠাকুরের 'রক্তকরবী'-র গোঁসাই।
১০। অরণ্য।
১২। সঙ্গীতের ছন্দ।
১৩। আয়ুর্বেদিক মতে শরীরের তিন ধাতুর একটি।
১৫। যে ক্রিকেটারের নাম সবার মুখে।
১৭। শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য ও বিখ্যাত বৈষ্ণবপদকর্তা এই 'দাস'।
১৯। শরৎগল্পে যার সুমতি হলো।
২০। ক্রিয়াপদে আগমন।
২১। বাজে খরচ।

এটি তৈরি করেছেনঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়, কাঁটালি, হুগলী।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ■ | ■ | ৫ |
| ■ | ৬ | | ■ | | ■ | ৭ | |
| ■ | | ■ | ■ | ৮ | ৯ | | |
| ১০ | | ১১ | ■ | ১২ | | ■ | |
| | ■ | ১৩ | ১৪ | ■ | ১৫ | ১৬ | |
| ১৭ | ১৮ | | | ■ | ■ | | ■ |
| ১৯ | | ■ | | ■ | ২০ | | ■ |
| | ■ | ■ | ২১ | | | | |

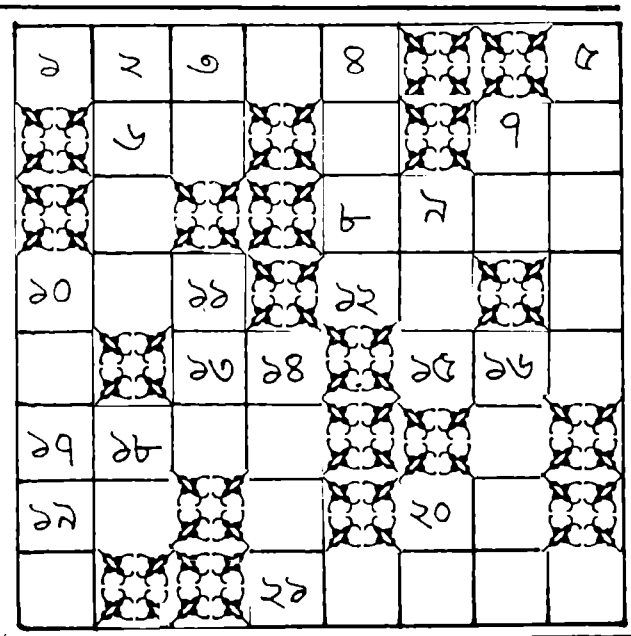

**উপর-নিচঃ**

২। উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম নদী।
৩। পেখমওয়ালা সাদা পায়রা।
৪। যমদর্শনে ঋষিকুমার।
৫। টেলিফোন আবিষ্কারক।
৭। ক্রিয়াপদে মেরামত করা।
৯। অবনঠাকুরের ছোটদের বুদ্ধকাহিনী।
১০। যে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের রূপকার।
১১। বৎসরের প্রথম দিন।
১৪। আদবকায়দা বা শিক্ষা।
১৬। হরিতাল।
১৮। রমণীয়।
২০। চিনির জননী।

আষাঢ় সংখ্যার
**নতুন শব্দমালার উত্তরঃ**
**পাশাপাশিঃ**
১। মগজ ৩। অনীক ৫। হার ৬। লোপ ৭। পাপ ৯। দেব সাহিত্য কুটির ১২। বেত ১৩। শুক ১৪। পক্ষে ১৫। কাক ১৫। নক্ষত্রলোক ১৮। বাতাসা ১৯। বরা ২০। নরদানব
**উপর-নিচঃ**
১। মহাদেব ২। গরব ৩। অপত্য ৪। কপাটি ৬। লোহিত ৮। পরনিন্দুক ১০। সাবেক ১১। কুরুক্ষেত্র ১৩। শুকতারা ১৪। পক্ষধর ১৫। কাবাব ১৭। লোচন

## হ-য-ব-র-ল

**জন্তুগুলোর ছবি ভুলভাল জোড়া লেগেছে। দেখ তো এদের ঠিকমতো জুড়ে দিতে পারো কিনা?**

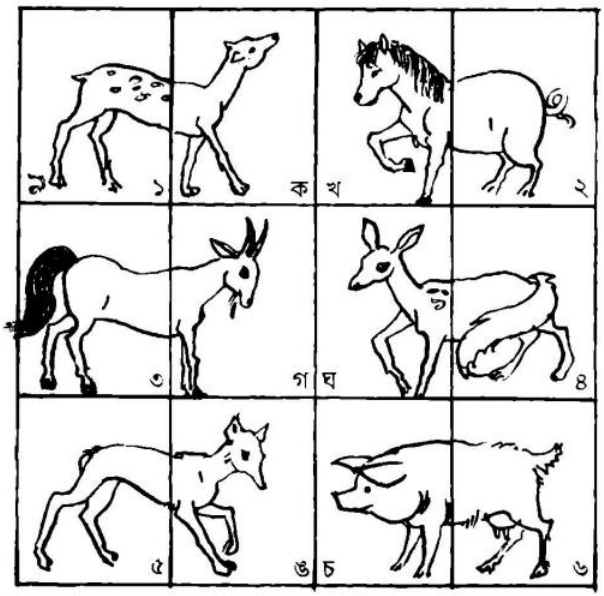




**সমাধানঃ**
১ আর ঘ (হরিণ); ২ আর চ (শুয়োর); ৩ আর খ (ঘোড়া); ৪ আর ঙ (শিয়াল); ৫ আর ক (গ্রেহাউন্ড); ৬ আর গ (ছাগল)।

## বৈশাখ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

**।। কলকাতা ।।**

সমন চট্টোপাধ্যায়/রবীন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট, যশোর রোড, কলি-২৮; সুলয়, সঙ্গীত, বাবা, মা, ও দাদি/হালদারপাড়া রোড, কলি-২৬; বাবা, মা, অভয়, পৃবালী ও শৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন, কলি-১১; বাবাই, মিম ও বুগান ঘোষ/নৃত্যগোপাল চ্যাটার্জী লেন, কলি-৩৭; অয়ন, অস্মিতা, অলোক ও শুভ্রা ভট্টাচার্য/মিউনিসিপ্যাল অফিস লেন, নাগেরবাজার, কলি-৭৪; মণিদীপা ও কাকলতা দাশ, স্বরূপ প্রামাণিক/রাজবাড়ি কলোনি, কলি--৮১; শ্যামল, ইলা ও সুজয়/বঙ্গশ্রী পল্লী, স্বামীজী রোড, কলি-৬০; মালবিকা, ছায়ারানি ও গৌরদাস সাহা/পর্ণশ্রী পল্লী, কলি-৬০; কমল, মীরা, মিম্মি, মিতিন, মৃনাল, ভটী ও রুকু/নিমতলা লেন, কলি-৬; ইন্দিরা, ফারহিন ও শাহিদ/জগদ্ধাত্রী বাণী মন্দির, ষষ্ঠীতলা, কলি-১১; অমৃতা, অরুতীর্থ ও জয়তী চৌধুরী/পশ্চিম কমলাপুর, দমদম, কলি-২৮; অরুণিমা ও শীলা মণ্ডল, কৌস্তুভ ও উৎপল ঘোষ/শুড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা, কলি-১০;

**।। ২৪ পরগনা (উঃ/দঃ) ।।**

মানস ও অনন্যা/ন'পাড়া কালীবাড়ি, বারাসাত (উঃ); পরেশ, মামণি, রাহুল ও রিপন/সিথিপাড়া, বারাসাত (উঃ); সানন্দা, সুদেষ্ণা, শান্তনু, চন্দ্রিমা, শান্তি, মনসা, রামদেব, বিশ্বরূপ ও রত্না ভট্টাচার্য/ভাটপাড়া (উঃ); বুলবুল, বাবুই, রামদেবদা, মণিষা, রত্না, ভবানী, শান্তি, নুকা, ফুলকি, সুভদ্রা, খোকনদা, মা ও বাবা/ভাটপাড়া, (উঃ); সোমনাথ ভট্টাচার্য, অর্পণা নন্দী, দীপেশরঞ্জন কর, সুশীল শ্রীবাস্তব, জয়জিৎ বোস ও ডলি চক্রবর্তী/নবজীবন কলোনি, বিদারপড়া (উঃ);

**।। হাওড়া ।।**

সৌম, সৌরভ, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী/অনন্তদেব মুখার্জী লেন, শিবপুর; গোপাল চ্যাটার্জী/অধ্যয়ন সম্মিলনী; সুদীপ ও কাকলি/বি. গার্ডেন, শিবপুর; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; সাধনা, বিশ্বজিৎ ও দেবজিৎ চ্যাটার্জী/বি. গার্ডেন, শিবপুর; কেদার, অমর ও পুষ্পিতা মণ্ডল/জি. আই. পি. কলোনি, ধাড়সা; মান্তু, অভিজিৎ, মাম্পি, রাসু, পিংকি ও সবিতা মজুমদার/সমবায় পল্লী, বালি; প্রিয়ব্রত ও প্রীতম মণ্ডল/ইছাপুর, সাঁত্রাগাছি; পিয়ালী, পল্লব ও পুলক/মুক্তারাম দে লেন; রীমা, পিয়ালী, লীনা, সোনালী, শুভদীপ, ইন্দু, বিন্দু ও পুলক/পঞ্চাননতলা; সুলেখা, শুভঙ্কর ও তনুশ্রী মালিক/নয়াচক, জোয়াড় গোড়ী; অর্ণব ও পল্লবিতা/কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া; সৃজন, রীনা ও বিদ্যুৎ নাথ/অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, শিবপুর; পুলক মজুমদার ও আমলিন ঘোষ/আমতল গলি, কদমতলা; প্রভাত, কৌশিক, শান্তা ও গীতা সরকার/সাতঘড়া লেন; দেবজ্যোতি, মালতী, রিয়া ও রবীন্দ্রনাথ মিত্র/খুরুট; প্রভাত ও তপতী গঙ্গোপাধ্যায়/মুক্তারাম দে লেন;

**।। হুগলী ।।**

কানন, মায়া, ডলি, দিলীপ, তুহিন, অশোক, সোমনাথ, গোপা, মানস, রূপা, রুম্মা, সোমা, সুজাতা, সুস্মিতা, বাপ্পাদিত্য, বুধাদিত্য, রজতশুভ্র, স্মৃতি, সবিতা, সঙ্গীতা ও রাহুল/চাতরা, শ্রীরামপুর; মৌ, মীরা, রিক্তা, শুভ্রা, ভোলা, পিকু, অপূর্ব ও বাবা/বিবেক পল্লী, শেওড়াফুলী; অতনু ও তনুশ্রী ময়রা/ময়রাপাড়া, রঘুনাথপুর; অতনু গাঙ্গুলী, সন্তু দাস ও সন্তা আঢ্য/তেলিনীপাড়া, কালীতলা; অশোক ব্যানার্জী,

টিপু, তাতাই, নিন্নি, চুমকী ও পমি/দ্বারিকজঙ্গল রোড, ভদ্রকালী; সুদীপ্ত, সুরূপা, সংঘমিত্রা, শুভদীপ ও সুমন পালিত/চোপা; দেবুদা, মিতালী, কমল, রজনী, নীলু, শেফালী, গণেশ, জবা, রানা, জুই, অমিয়দা ও সজল/চাতরা, শ্রীরামপুর; অণু, জগা, টুনটুনি, রবীন, বাবুলাল, সঞ্জীব ও মুনমুন/গেঁড়ির ডাঙা; দিগন্ত, কাজলী ও অস্মিত চক্রবর্তী/শিরীষতলা, জি. টি. রোড; ঈশান, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও অশোককুমার মুখার্জী/আশুতোষ চ্যাটার্জী লেন, মাহেশ;

॥ **বর্ধমান** ॥

চিত্রলেখা ও সৌম্য সেনগুপ্ত/কুলটি; টেটো, টুবাই ও দুলাল কাকা/বাংকোলা এরিয়া কলোনি, উখড়া; পৃথ্বিজিৎ ও শিঞ্জিনী বকসী/এস. বি. গড়াই রোড, আসানসোল; পাপু, শিল্পী ও রিমি মিত্র/ছোট নীলপুর (সদর); সুমিত, অঙ্কুর, ছায়া ও শুভ/কুলটি; তপোব্রত, তিলোত্তমা, ঊর্মিব্রত, সুস্মিতা, সিদ্ধানন্দা, পুষ্পু, সঙ্গীতা, সুচরিতা, শুভাশিস, ও কুলকলি/অফিসার্স কলোনি, হিন্দুস্তান কেবল্‌স্; সুমেধা, ঋতুপর্ণা, দেবশ্রুতি ও সুশ্বেতা/বার্নপুর; ঋষি, সামু, শ্রী, সু ও বুয়ান/খালুইবিল; শ্রীপার্থ ও সুকান্ত মুখোপাধ্যায়/বল্লভপুর; রাহুল চট্টোপাধ্যায়/বাবুইশোল কলোনি, ঘনশ্যাম গলি; বাবু, কাকলি ও রিঙ্কু মুখার্জী/ধ্রুবডাঙা, বার্নপুর; অঞ্জন ও অদিতি রায়চৌধুরি/ভাতার, কদমতলা; স্বপন, সিধু, বুবুন, সুবল, রবি ও তিমিরবরণ চঁদ/গুসকরা; পলাশ, নয়ন, পারিজাত, লোটন ও ছোটন ঘাঁটি/ঘাঁটী গলি, আসানসোল; পারমিতা, ডালিয়া, জয়তী ও প্রিয়াঙ্কা ঘাঁটী/আসানসোল; সবাসাচী, রীনা ও শ্রেয়া কোলে/দুর্গাপুর; পৌলমী ও গৌতমী/বিধাননগর, দুর্গাপুর;

॥ **বাঁকুড়া** ॥

দেবি দাস, মদন ও ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক/চাতরার মোড়, দিগপাড়; ডলি, বকুল ও দেবিদাস ব্যানার্জী/দিগপাড়, চাটুজ্জে পাড়া; তরুণ, রুমা ও বরুণ সরকার/মেজিয়া; অয়ন, পায়েল, লাবণ্য ও অশোক দাস/দোলতলা; জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও নটুবিহারী রুইদাস/অর্ধগ্রাম; বিকাশ, ইন্দ্রনীল ও মীনা রায়, শম্পা ভক্ত ও প্রশান্ত বায়েন/স্কুলপাড়া, মেজিয়া; সিদ্ধার্থ, ফাল্গুনী, অর্ণব, অনীতা, মিনতি ও স্মিতা মুখোপাধ্যায়/অর্ধগ্রাম; সীমা, জয়ন্ত, সুশান্ত ও সুদর্শন মণ্ডল/রানীবাঁধ; অজিত ঘোষ/নতুনগ্রাম;

॥ **মেদিনীপুর** ॥

সুবীর, জয়তী সরকার ও মা/বাড়বড়িশা, কোলাঘাট; শ্রীলেখা, মণিকা, সুপ্তি ও স্বর্ণেন্দু নায়ক/গড়বেতা; সুবজিৎ, সুপর্ণা ও শুভায়ু কোলে/নিমপুরা; বাবা, মা, সৌমিক ও সৌভিক চৌধুরি/গড়বেতা;

॥ **মুর্শিদাবাদ** ॥

নির্মলেন্দু ও শরদিন্দু প্রামাণিক/জগন্নাথপুর; মন্দিরা ও মধুরিমা মিত্র/মধুপুর রোড, বহরমপুর; অদিতি, দেবারতি ও দেবজ্যোতি মুখার্জী/পিলখানা রোড, বহরমপুর; সর্বাণী ও সঞ্জয় সাহা/খাগড়া;

॥ **পুরুলিয়া** ॥

নিত্য, কল্পনা, বিকাশ, পলাশ ও মৌসুমী/লাগদা; কালিদাস চক্রবর্তী ও দীপককুমার চৌবে/আনাড়াগ্রাম; মা, বাবা, সুদীপা ও সৌভিক মণ্ডল/চিরুভিল্যাম্প অফিস, রাধানগর;

॥ **বীরভূম** ॥

তপেন্দু, বেবী ও শুভম পট্টনায়ক, বিপিন বিশ্বাস ও অনুপ রায়/অরবিন্দ পল্লী, সিউড়ি; আবৃতা, নন্দিতা ও আবির চট্টোপাধ্যায়/শান্তিনিকেতন; লাল, মামণি, মিনু ও সোমনাথ/স্কুল বাগান, বোলপুর;

॥ **জলপাইগুড়ি** ॥

সমরকুমার দে/শিববাড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি; অশোক, সুমন্ত, সৌগত ও মীনা কুণ্ডু;

॥ **বিহার** ॥

কাকীমা, পিংকু ও বিভাস/আই. এস. এম, ধানবাদ; দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মীনা সেনগুপ্ত/জামশেদপুর; সন্দীপ, সীমা, শান্ত, পিন্টু, বুল্টি ও পিংকি/প্রমথনগর, জামশেদপুর; সন্দীপ, সজল, সাধু, মলয়, বাবলু ও ধীমান/যোগী কমপ্লেক্স, জামশেদপুর; নিরঞ্জন ও রুবেন করগুপ্ত/জামশেদপুর; জগা, থিনা, টুলু ও নান্টু/মহুলীশোল, পূর্ব সিংহভূম; মা, বাবা, দাদু, কৌশিক ও সৌমিক আশ/চিরকুণ্ডা; মলয়, সোমা, রেখা, পুতুল, সর্বাণী, সীমা, রাজু, মিঠু, টুলু, জয়ন্ত, মানস, তাপস, আলোমণি, ঝন্টু, অসীম, স্বপন, পিন্টু, বেবী, রীম্পা, অনিন্দিতা, ঝুমা, কৃষ্ণা, মাখন, রীতা, অক্ষয়, কালী, বুকাই, বাণী ও সৌমিত্র/কোকপাড়া, পূর্ব সিংভূম; ইন্দ্রজিৎ, বিমল, আশিস, মলয়, লক্ষ্মীনারায়ণ ও দয়ানিধি/মহুলীশোল উচ্চবিদ্যালয়, পূর্ব সিংভূম; তনুজা, গৌরী, তনুশ্রী, শ্যামা ও মঙ্গলী/মহুলীশোল, পূর্ব সিংভূম;

॥ **অসম** ॥

উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং; পিউ, চয়ন, রত্না, টুয়া, টুপাই, পিকু ও দেবরূপা দত্তরায়/গৌহাটী;

॥ **উড়িষ্যা** ॥

মোগলী, পুটেই, পাপা ও মা/কটক;

॥ **মধ্যপ্রদেশ** ॥

দিয়া, সুস্মিতা ও অঞ্জন রায়/কুশমুণ্ডা কোলিয়ারী, কুশমুণ্ডা;

# জানো কী

- ভোর ৬-৪০। বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে কাশ্মীর উপত্যকা। হঠাৎ দুম...দুম...দুম...ট্যারা রা...রা...রা... চুপিসাড়ে হানাদাররা কখন যে এগিয়ে এসেছে...আর তারপর?
- একই গাছ থেকে টমেটো আর আলু পাড়া যায়, কিংবা হাঁটতে হাঁটতে টিভি দেখা? এও কি কখনো সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে—কিন্তু কিভাবে?
- দোয়েল গান গাইতে ভালোবাসে। দাদুর কড়া হুকুম গান গাওয়া চলবে না। কিন্তু একদিন...কি হলো?
- রাজকন্যার জন্যে ছেলে আর পছন্দ হয় না চীন-সম্রাটের। কিন্তু বিয়ে তো দিতে হবে! সম্রাট একদিন সকলকে ডেকে পাঠালেন রাজধানীতে। আর তারপরই...
- অভিনব সেই অনুষ্ঠান নিয়ে মেঘমালার মা মেতে উঠলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে সব বিভাগে অংশ নেবে। আর তাই নিয়েই শেষপর্যন্ত...কি হলো?

এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবে শুকতারার ভাদ্র সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু—যা তোমাদের চমকে দেবেই।

সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

# জোরাণ্ডা ডাকবাংলোয়

রামকৃষ্ণ দত্ত

কলকাতার এসপ্ল্যানেড গুমটি থেকে বাস ছেড়ে দিল সকাল সাড়ে ছটায়। সিদ্ধার্থরা চার বন্ধুতে যে বাসটায় উঠলো, সেটা উড়িষ্যার কেওনঝোড় পর্যন্ত যাবে। তবে ওদের গন্তব্যস্থল আপাতত কেওনঝোড় নয়, অনেক আগেই একটা জায়গা— নাম যোশীপুর। এই যোশীপুর থেকে ওদের আরও পঁচাত্তর মাইল জঙ্গলের পথে গিয়ে জোরাণ্ডা ডাকবাংলোয় ওঠবার কথা। এই অঞ্চলটা উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার মধ্যে, নাম সিমলীপাল।

বিপদ্‌সঙ্কুল এই অরণ্যযাত্রার নায়ক সিদ্ধার্থ। সঙ্গে আছে আরও তিন বন্ধু— নবেন্দু পালিত, ভবানী রায় আর সনাতন মিশ্র। এদের বয়স প্রায় বছর চব্বিশের মধ্যে, কেবল সনাতন মিশ্রই কিছু বড়, তাই দাদাগিরি করার প্রবণতা ওর মধ্যে দেখা যায়। তা ছাড়া ও একজন ভাল শিকারীও বটে। শিকারের অভিজ্ঞতা যে ওর ছোট থেকেই আছে, একথা বন্ধুরা জানে।

সনাতন মিশ্রই প্রথম উড়িষ্যায় যাবার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটায় সিদ্ধার্থ ছাড়া বাকি দুজনে সম্মতি জানিয়েছিল।

ভোরের শিরশিরে হাওয়া প্রথমটা চার বন্ধুকে বেশ আনন্দ দিচ্ছিল। ক্রমশ গাড়ির গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ শীতের বাতাসটা এত কনকনে হয়ে উঠলো যে বাধ্য হয়েই ওদের জানলার কাচগুলো বন্ধ করে দিতে হলো। দুপাশের ধুধু মাঠ, ধানক্ষেত, পুকুর পিছনে ফেলে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলল বাস।

সিদ্ধার্থ সনাতনকে উদ্দেশ করে বললে, 'হ্যাঁরে, তোর কথামতো তো এই গভীর জঙ্গলে বেশ আনন্দ করেই বেড়াতে আসা হলো, তা সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক কিছু আনার প্রয়োজন ছিল না?'

সনাতন বললে, 'সে কথা কি আর আমি ভাবিনি মনে করেছিস? সব ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। যোশীপুর চল, তারপর দেখতে পাবি আমার ব্যবস্থাটা কি!'

সনাতনের কথায় ওরা সবাই খুশি হলো। সনাতন একজন ভালো শিকারী, কিছু একটা ব্যবস্থা যে করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্রেকফাস্টের জন্য বাসটা কোলাঘাটে দাঁড়াতেই, যাত্রীরা একে একে নেমে গেল। বাস প্রায় যখন ফাঁকা হয়ে গেছে, সিদ্ধার্থরা নামতে যাবে, একজন ভদ্রলোক ওদের উদ্দেশ করে বললেন, 'কতদূর যাচ্ছেন ভাই আপনারা, কেওনঝোড় নাকি?'

সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করলে ভদ্রলোককে, মাঝবয়সী, সুন্দর স্বাস্থ্য। গায়ে পড়ে কোনো লোককে কথা বলতে দেখলে সিদ্ধার্থর কেমন যেন সন্দেহ হয়। তাই সে গম্ভীর গলায় জবাব দিলে, 'না, অনেক আগেই নামব।' এরপর এমনভাবে বাস থেকে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, যাতে ভদ্রলোক আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে না পারেন। নবেন্দু আর ভবানীও ওকে অনুসরণ করল। সনাতন বাসেই বসে রইল।

একটু পরে সনাতন লক্ষ্য করল ভদ্রলোক ফ্লাস্ক থেকে কিছু একটা পানীয় ঢালতে ঢালতে বললেন, 'একটু কফি চলবে নাকি ভাই?'

সনাতন একটু ইতস্তত করে বললে, 'দিন, তা আপনি বুঝি দোকানের চা-কফি খান না?'

ভদ্রলোক বললেন, 'সঙ্গে রাখা অভ্যাস করেছি।' এরপর ভদ্রলোক অন্য প্রসঙ্গে এলেন, বললেন, 'কলকাতা থেকেই তো আপনাদের বাসে উঠতে দেখলাম, তাই না? তা আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?'

সনাতন বললে, 'আরে দাদা, জায়গা কি একটা, নানা বনে-জঙ্গলে বেড়াব বলে এসেছি। জানি না ডাকবাংলোগুলো খালি পাব কিনা!'

'একথা বলছেন কেন?'

'শুনেছি ডাকবাংলোগুলোয় সরকারের অফিসার, ফরেস্টার, রেঞ্জার বা ভি.আই.পি যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাহলে জায়গা পাওয়া যায় না। তাই ভয়ে ভয়ে আছি।'

'এই কথা?' ভদ্রলোক হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ করে। 'তা দলে আপনারা কতজন আছেন?'

'আমরা চার বন্ধু এসেছি।'

'মোটে চারজন! তাতেই ভাবছেন জায়গা পাবেন কিনা? বাংলোগুলো তো খালিই পড়ে থাকে শুনেছি। তাছাড়া এই দিকে সহজে কেউ আসে নাকি?'

এবার একটু ইতস্তত করে সনাতন জিজ্ঞেস করে, 'যদি কিছু মনে না করেন আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'সচ্ছন্দে।' উত্তর দেন ভদ্রলোক, 'আমার নাম ত্রিলোচন মোহান্তি।'

ওদের কথার মধ্যে বাকি তিন জন বাসে ফিরে আসে। তাদের দেখিয়ে সনাতন বললে, 'ত্রিলোচনবাবু, এরাই আমার তিন বন্ধু—নবেন্দু, ভবানী আর সিদ্ধার্থ।'

'বাঃ, বেশ, বেশ।'

এতক্ষণে আবার বাস চলতে শুরু করেছে। সিদ্ধার্থের ওই ত্রিলোচন মোহান্তিকে প্রথম থেকে খুব একটা ভাল বলে মনে হয়নি, কেমন যেন গায়ে পড়া ভাব। লোকটার অন্য কোনো মতলব আছে কিনা কে জানে! চুপি চুপি সে সনাতন আর ভবানীকে একটু রাগতভাবে বললে, 'তোরা অত কি কথা বলছিস লোকটার সঙ্গে? লোকটাকে জানিস না, চিনিস না, তার ওপর নতুন জায়গা, একটু সাবধানে থাকাই ভাল নয় কি?'

বাস ছুটে চলেছে একটার পর একটা পাহাড় আর জঙ্গল ফেলে কিছুক্ষণ আগেই ওরা বাঙ্গীপোষিতে লাঞ্চ সেরে নিয়েছে। বাসের দুলুনিতে ওরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ত্রিলোচনবাবুর ডাকে তন্দ্রা কেটে গেল। ত্রিলোচনবাবু বললেন, 'বিষয়ি এসে গেছে, আমি এখানেই নামছি আশা করি পরে আবার দেখা হবে।'

সিদ্ধার্থ কটাক্ষ করে বন্ধুদের শুনিয়ে বললে, 'আর দেখা হয়ে কাজ নেই।'

বেলা গড়িয়ে কখন যে দুপুর হয়ে গেছে ওদের খেয়ালই ছিল না! চার বন্ধু কাচের জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। কোথাও নিবিড় ঘন জঙ্গল, কোথাও ধু-ধু প্রান্তর, কোথাও একটুকরো সমতল ভূমি, কোথাও আবার উপলখণ্ডর ওপর দিয়ে নেচে চলেছে নদী। গাছে গাছে কত রঙের ফুল, ফুল আর পাখিদের মিষ্টি ডাক। সব কিছুর সমন্বয় ও তার বিচিত্র অনুভূতি ওদের চারজনকে ক্রমশ অভিভূত করে তুলল।

হঠাৎ ওদের চোখে পড়ল, বাস রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা ছোট ঝিলের ধারে একদল হরিণ জল খাচ্ছে। ওদের গায়ের রং গাঢ় ছাই, তার ওপরে সাদা স্পট। সব মিলিয়ে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল হরিণগুলোকে। বাসের আওয়াজে ভীতচকিত হয়ে হরিণগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবুজ ঘন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। এমন অভাবনীয় দৃশ্য সিদ্ধার্থদের পাগল করে ক্ষণিকের জন্য।

একটু পরে বাসটা যোশীপুরে এসে পৌঁছাল সনাতন বললে, 'এখান থেকে একটু দূরে রয় লজ স্টপেজ। সেখানেই বাস থেকে নামব।'

এরপর সনাতনের কথামতো ওরা চার বন্ধুতে যোশীপুরের রয় লজে এসে উপস্থিত হলো। বাসটা তখন কেওনঝোড়ের পথে এগিয়ে চলেছে।

ডাঃ শুভেন্দু রায় হলেন এই লজের মালিক। প্রথম আলাপেই মনে হলো লোকটি খুব অমায়িক প্রকৃতির। ডাঃ রায়ের সঙ্গে সনাতনের কথাবার্তার ধরন দেখে সিদ্ধার্থরা বুঝতে পারল ডাঃ রায় ওর আগে থেকেই পরিচিত।

রয় লজে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে সিদ্ধার্থরা বিশ্রাম করছিল। সেই ফাঁকে সনাতন তার ডাইরি খুলে রোজনামচা লিখতে বসল, 'সেই সকাল সাড়ে ছটায় কলকাতা থকে বাসে করে চার বন্ধু বেরিয়েছি। কোলাঘাটে ব্রেকফাস্ট সারা, বাঙ্গীপোষিতে লাঞ্চ খাওয়া, আবার কোলাঘাটেই ত্রিলোচন মোহান্তির সঙ্গে আলাপ...ত্রিলোচনবাবু বিষয়িতে নেমে গিয়েছিলেন। বিশেষ পরিচয় দেননি। তবে কথাবার্তায় বোঝা গিয়েছিল, জঙ্গলে ঘোরাই ওঁর কাজ। বাস থেকে নামবার সময় বলে গিয়েছিলেন, আশা করি আবার দেখা হবে।'....ইত্যাদি ইত্যাদি.....

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। সন্ধ্যের মুখে ডাঃ রায় এলেন সিদ্ধার্থদের ঘরে ওদের খোঁজখবর করতে। ওদের বনে-জঙ্গলে বেড়াবার প্রসঙ্গটা স্বভাবতই উঠল। ডাঃ রায় বললেন, 'সনাতনবাবু এখানকার জঙ্গলের ডাকবাংলোয় আপনাদের থাকার ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই করেছিলেন। আপনারা কালই বেরিয়ে পড়ুন। তবে কোন ডাকবাংলোয় আগে যাবেন সেটাই হলো কথা! শুনেছি সিমলীপাল ফরেস্টের পুরনো ফরেস্টার এখান থেকে বদলি হয়ে উড়িষ্যার ঢেনক্যানালে অঙ্গুল ফরেস্টে চলে গেছেন। আর নতুন ফরেস্টার নাকি এসে গেছেন সিমলীপালে। তবে তিনি আপাতত কোন ফরেস্ট বাংলোয় আছেন সেটাই জানতে হবে প্রথমে। কারণ এঁর থাকার ওপরই কোন বাংলোয় আপনারা গিয়ে থাকবেন, সেটা নির্ভর করছে! ভদ্রলোকের নাম এখনও জানি না। যাই হোক, কাল ভোরে আপনারা আমার জীপে করে প্রথমে জোরাণ্ডা ডাকবাংলোতে চলে যান। সঙ্গে আমার ড্রাইভার সন্তোষ আর বিরিঞ্চি থাকবে। আমি ওদের সব রকম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

এখান থেকে জোরাণ্ডার দূরত্ব কমপক্ষে পঁচাত্তর মাইল হবে। জোরাণ্ডায় হাতি দেখতে পাবেন। এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতির লোকজনেরা নাকি জঙ্গল থেকে অনেক হাতি ধরেও নিয়ে যায় ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে। তাছাড়া ডাকবাংলোটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে হলেও খুব নিরাপদ জায়গা, গেলেই দেখতে পাবেন। একটা কথা বলে রাখি, ডাকবাংলো বা জীপ ছেড়ে যেন জঙ্গলের রাস্তায় পায় হেঁটে বেড়াবেন না। এতে বিপদের ঝুঁকি আছে। যদিও সনাতনবাবুর কথামতো আমি একটা ডবল বোরের বড় বন্দুক বিরিঞ্চির সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি, তবুও সাবধান। নিজেকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে একান্তই যদি প্রয়োজন হয় তবেই বন্দুক ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে উড়িষ্যা সরকার। নিজের খুশিমতো শিকার করার জন্য নয়।' কথাগুলো বলে ডাঃ রায় আমাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর আবার বলেন, 'যদি দেখেন জোরাণ্ডা ডাকবাংলো খালি নেই তবে অন্য আরও ডাকবাংলো আছে, যেমন চাওলা, বেয়রাপানি প্রভৃতি। চাওলাতে ডরমেটরিও আছে। আমি সন্তোষকে বলে দেব যেমন বুঝবে সেইভাবেই থাকবার জায়গা সে ঠিক করবে। তাছাড়া বিরিঞ্চিও খুব ভাল শিকারী, আর বন্দুক চালাতে খুবই ওস্তাদ।'

ডাঃ রায়ের কথা শুনে সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে যায়। সনাতন সব বন্দোবস্ত ইতিমধ্যে করে রেখেছে! সনাতনের অন্য বন্ধুরাও ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জঙ্গলে থাকবে ভাবতেই কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগে মনে।

খুব ভোরে জীপ রয় লজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল অরণ্য অভিযানে। ডাঃ রায়ের কথামতো ওরা সঙ্গে নিলে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, আর ডিম। এছাড়া কিছু ছোটখাট অস্ত্রও রইল ওদের হাতে। তবে সনাতন একটা বন্দুক সঙ্গে নিলে। আর বিরিঞ্চির হাতে তো ডাঃ রায় আগেই বন্দুক দিয়ে রেখেছিলেন। জানা গেল প্রত্যেক ডাকবাংলোতেই একজন করে কেয়ারটেকার থাকে।

বেশ খানিকটা চলার পর চারিদিকে ঢাকা জীপটা ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করল। সূর্যের আলো সকালের জঙ্গলকে, সবুজের সমারোহকে যেন সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। শাল, পিয়াল, মহুয়া, ইউক্যালিপটাস, আরও কত কি জংলী গাছ রাস্তার দুপাশে ফেলে জীপটা বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে পরপর দুটো গুলির আওয়াজ শোনা গেল। জীপের গতি একটু কমিয়ে দিলে সন্তোষ ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য। একটু পরেই দেখা গেল ছোটবড় একপাল শিংওয়ালা সম্বর রাস্তার একপাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। জীপটাকে দেখেই আবার রাস্তার অন্য পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল চারিদিকে ধুলো উড়িয়ে। ততক্ষণে সন্তোষ জীপটাকে দাঁড় করিয়েছে। বিরিঞ্চি বললে, 'নিশ্চয় গুলির আওয়াজে ওরা ভয় পেয়ে এই ভাবে দৌড়াচ্ছে। বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি! এই সাত-সকালে গুলি চালাল কে? জানতে পারলে ব্যাপারটা বোঝা যেত। সন্তোষ, তুই চল তাড়াতাড়ি।' কথা কটা বলে বন্দুকটা শক্ত হাতে ধরে বসে রইল নতুন কোনো বিপদের আশঙ্কায়।

সন্তোষ আবার জীপে স্টার্ট দিতেই, সকলে শুনতে পেল বাঘের ডাক। পরমুহূর্তেই দেখা গেল একটা হাত ছয়েক লম্বা চিতাবাঘ পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওদের জীপটা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জীপটা চারিদিকে ঢাকা। চিতাটা কিছু করবার আগেই সন্তোষ গাড়িটা একটু এগিয়ে নিলে। বিরিঞ্চি লক্ষ্য করলে চিতাটার একটা পা দিয়ে রক্ত ঝরছে খুব। আহত হয়ে যন্ত্রণার চোটে রাগে গরর্ গরর্ করছে। এইবার বোঝা গেল জন্তুটার পা-টা জখম হয়েছে গুলি লেগেই। কিন্তু এখানেও সেই প্রশ্ন! গুলিটা করল কে!

পরক্ষণেই চিতাটা আবার লাফিয়ে উঠে জীপটাকে আক্রমণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে বিরিঞ্চিও হাতের বন্দুকটা জীপের জানলার বাইরে বার করে শূন্যে একটা ফায়ার করলে—গুড়ুম। নিস্তব্ধ জঙ্গলটা চকিতে চঞ্চল হয়ে উঠল গুলির আওয়াজে। চিতাটাও ভয়ে এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেদিকে একটু আগে

সম্বরগুলো দৌড়ে পালিয়েছে। গুলির আওয়াজ, জন্তুদের অমন অস্বাভাবিক আচরণ আর বিরিঞ্চি-সন্তোষের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে চারবন্ধু অ্যাডভেঞ্চারের আশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

ওরা বিরিঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, গুলি ছুঁড়লেন কেন?'

বিরিঞ্চি বললে, 'ভয় দেখিয়েছি নিজেদের বাঁচবার জন্য। না হলে চিতাটা এতক্ষণে জীপটাকে আর আমাদের একসঙ্গে ছিঁড়েফুঁড়ে শেষ করে ফেলত।'

একটু পরেই সন্তোষ রাস্তার ধারে একটা জায়গায় জীপ দাঁড় করাল। জায়গাটা পাহাড়ে ঘেরা। বিরিঞ্চি সনাতনকে উদ্দেশ করে বললে, 'ঐ দেখুন দূরে দেখা যাচ্ছে বেয়রাপানি ডাকবাংলো। ছবির মতো সুন্দর। চারপাশে ইউক্যালিপটাসের সারি, পরিবেশটাকে আরও মনোরম করে তুলেছে।'

জীপের মধ্যে বসে থাকা চার বন্ধু বাংলোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করলে বাংলোয় যাবার রাস্তাটার ওপর দুটো খরগোশ এসে চোখ বড় বড় আর কান দুটো খাড়া করে জীপের দিকে তাকিয়ে আছে। বিরিঞ্চিকে জীপ থেকে নামতে দেখেই ওরা থপ থপ করে রাস্তার ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল।

বিরিঞ্চি জীপ থেকে নেমে ডাকবাংলোর রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা ভেতরে গিয়ে ডাকলে 'অভিরাম আছ নাকি?'

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বছর সাতাশের এক যুবক। গায়ে ছেঁড়া লাল রংয়ের গেঞ্জি আর খাকি হাফপ্যান্ট পরা।

বিরিঞ্চি জিজ্ঞেস করল, 'অভিরাম, ডাকবাংলো খালি আছে? কলকাতা থেকে চার বন্ধু এসেছে, দু-একদিন বাংলোতে রাত কাটাতে চায়। যোশীপুরে আমাদের লজে উঠেছে, ডাক্তারবাবুর গেস্ট। জীপে বসে আছেন ওঁরা, কি বলব?'

'এখানে তো থাকা যাবে না, বিরিঞ্চিদা। নতুন ফরেস্টার সাহেব কাল সন্ধ্যেবেলা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জীপ নিয়ে হঠাৎ এসে হাজির। আজ সকালবেলাই রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে গেছেন এখানকার ফরেস্ট দেখতে। নতুন লোক তো, এ অঞ্চলে এর আগে কখনও এসেছেন কিনা জানি না! আজ রাতেও এখানে থাকবেন, তাই...'

বিরিঞ্চি বললে, 'অভিরাম তোমার অত চিন্তা করার কিছু নেই, আমরা জোরাণ্ডা বাংলোতেই যাচ্ছি।'

এতক্ষণে বিরিঞ্চি বুঝতে পারে জঙ্গলে যে গুলির আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল তা ফরেস্টার সাহেবেরই রাইফেলের গুলি। বিরিঞ্চি আবার জীপে ফিরে আসে। সন্তোষকে সব ব্যাপারটা খুলে বলে, তারপর সন্তোষ জীপে স্টার্ট দেয়। বিরিঞ্চি জীপের সামনে এসে বসে সন্তোষের পাশে।

জোরাণ্ডার পথ অনেকটা এখনও বাকি। রাস্তার ধারে কতকগুলো ঝিরঝিরে ছোট নদী আর ছোটবড় পাহাড় ফেলে জীপটা আঁকাবাঁকা রাস্তায় এগিয়ে চলে। একটু পরেই ওরা দেখতে পায় বুড়িবালাম নদীর ওপর একটা জলপ্রপাত। সন্তোষই নদীটার নাম বলে সিদ্ধার্থদের।

সিদ্ধার্থরা সন্তোষকে জীপ থামাতে বলে। এরপর ওরা জীপ থেকে নেমে জলপ্রপাতের চারপাশটা যখন দেখছিল তখন হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। গুলির শব্দে ওরা তাড়াতাড়ি জীপে উঠে পড়ল। বেয়রাপানি থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইলের মতো রাস্তা ফেলে ওদের জীপটা চলে আসবার পর রাস্তাটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করতেই আবার দুটো গুলির আওয়াজ ওরা শুনতে পেল—গুড়ুম! গুড়ুম!

সারা জঙ্গল বিদীর্ণ করে আওয়াজটা যেন বাতাসে ঢেউ খেলে গেল, আর চারদিকে তার প্রতিধ্বনি হয়ে চলল গুড়ুম...গুড়ুম...গুড়ুম....সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা জন্তুর বীভৎস চিৎকার। তারপরই সব চুপ।

এবার কিন্তু বিরিঞ্চি আর সন্তোষকে এই আওয়াজ নতুন করে চিন্তায় ফেললে। দিনদুপুরে একটা অজানা বিপদের ইঙ্গিত মুহূর্তের মধ্যে ওদের শিহরিত করে তুলল। পরিস্থিতি কি করে সামাল দেবে তাই নিয়ে জীপের সবাই চিন্তান্বিত। তবে বেশ কিছুক্ষণ জীপটা চলার পর বিপদের কিছু চিহ্ন দেখতে না পেয়ে ওরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো।

ক্রমশ জঙ্গল ঘন থেকে আরও ঘন হতে লাগল। অনেকক্ষণ জার্নি করে সকলকেই বেশ রুক্ষ দেখাচ্ছিল। ক্লান্তিতে আর গাড়ির দুলুনিতে চার বন্ধু একটু ঘুমিয়েও পড়েছিল। বিরিঞ্চিও বন্দুকটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে ঢুলছিল। ঘুম নেই শুধু সন্তোষের চোখে। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে ড্রাইভ করে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তাটা বাঁক নিতেই হাতির বিকট চিৎকার শুনতে পেল ওরা। বিরিঞ্চি বললে, 'এ তো হাতির কান্নার আওয়াজ।'

সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'হাতি কাঁদে! কারণটা কি?'

'কারণটা হয়তো এখুনি জানতে পারবেন', সন্তোষ উত্তর দিল।

তার কথা শেষ হতে না হতেই অনেক দূরে রাস্তার ধারে দেখা গেল প্রায় দশ-বারোটা ছোটবড় হাতি জায়গাটা ঘিরে আছে। আর তার মধ্যে একটা হাতি থেকে থেকে করুণ সুরে চিৎকার করে উঠছে। সে কি কানফাটানো আওয়াজ!

রাস্তার দুপাশেই উঠে গেছে দুটো পাহাড়। পাহাড়গুলো ঘন ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি। ওদের জীপটা আরও একটু এগোতেই ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল, একটা বিরাট দাঁতাল হাতি রাস্তায় পড়ে আছে! আর তার মাথার পাশে একটা জায়গা থেকে ঘন চাপ চাপ রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে ছড়িয়ে আছে রাস্তাটার চারিদিকে।

বিরিঞ্চি বললে, 'একি, হাতিটাকে গুলি করা হয়েছে দেখছি!'

'এখানে কে গুলি করতে আসবে?' কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস

করে সিদ্ধার্থ।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় সন্তোষ, 'এই সব জঙ্গলে দুষ্টু লোকের অভাব নেই।'

বিরিঞ্চি তাকায় সন্তোষের দিকে, 'ব্যাপারটা ভাল বুঝছি না। তুমি সোজা রাস্তা ধরে আর এগিও না। হাতির দল ক্ষেপে যেতে পারে। তখন হয় শুঁড়ে জড়িয়ে আমাদের পিষে মারবে, নয়তো জীপটাকে ঠেলে পাহাড়ের নিচে ফেলে দেবে। ওদের কাছে অসম্ভব কিছুই নয়।'

বিরিঞ্চির কথায় গুরুত্ব দিল সবাই। যে কোনো মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটতে পারে। তাই সন্তোষ জীপটাকে নিয়ে এগোল না।

দু-এক মিনিট নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জীপটাকে নিয়ে বেশ খানিকটা পথ পেছিয়ে গিয়ে চওড়া রাস্তা ছেড়ে বাঁক জঙ্গলের পথ ধরে জোরাণ্ডার দিকে এগিয়ে চলল।

পাহাড়ী রাস্তা, মাঝে মাঝে ঝোপজঙ্গলে ওদের জীপটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। রাস্তা এবার ক্রমশ নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে সামনেই হাইওয়ে পাওয়া যাবে! জীপটাও নামছে দ্রুতগতিতে। হঠাৎ ওদের চোখে পড়ল আর একটা জীপ পাহাড়ের অনেক নিচে জঙ্গলে পড়ে আছে। দেখে দুর্ঘটনা বলেই মনে হলো। জায়গাটা পেরিয়ে আর একটু এগোতেই জীপটা আরও গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম।

জঙ্গলে কোনো হিংস্র জন্তুর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে বিরিঞ্চি বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। তাছাড়া জীপটার চারিদিক বেশ ভাল করে ঘেরাও রয়েছে। হঠাৎ একটা লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে জীপটাকে থামাতে বললে। লোকটার চোখে গগলস্ আর মুখে চাপদাড়ি। দেখলে বেশ ভয় করে।

সন্তোষ জীপ থামাল না, বেরিয়ে গেল। কিছুদূর এগোতেই ষণ্ডামার্কা চারটে লোক এবার ওদের রাস্তা আগলে দাঁড়াল। প্রত্যেকের হাতেই রিভলবার। জীপটাকে ওরা চেঁচিয়ে থামাতে বলল। বিরিঞ্চি অবস্থা বুঝে হাতের বন্দুক আড়াল করে সন্তোষকে চুপি চুপি জীপটা থামাবার কথা বললে। সন্তোষ এবার জীপ থামাল। দেখা গেল সামনে একটা বিরাট গাছ পড়ে আছে। কেউ যেন উপড়ে ফেলেছে বলেই মনে হলো! কাছাকাছি কোথায় যেন আবার হাতির চিৎকার শোনা গেল। একটা লোক জীপের সামনে এসে সন্তোষকে উদ্দেশ করে বললে, 'আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? গাড়িতে লোক কতজন?' তার গলার স্বরটা বেশ গম্ভীর।

লোকগুলোকে দেখলেই ভয় করে। বিরিঞ্চিরা এ পথে বহুবার আসা-যাওয়া করে, কিন্তু কোনো দিন এরকম ঝামেলায় পড়তে হয়নি! সিদ্ধার্থদের কথা বেমালুম চেপে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, 'আমরা দুজন আছি। যাচ্ছি জোরাণ্ডা ফরেস্ট বাংলো।'

'খুব ভাল, দেখুন এই যে গাছটা পড়ে আছে এটা একটু আগে একটা বুনো হাতি উপড়ে ফেলেছে। আর চারদিক থেকে আমাদেরও হাতির দল ঘিরে ফেলেছিল। এই বিপদে আমরা তাই আপনাদের সাহায্য চাইছি। আমরা একটা জিনিস আপনাদের গাড়িতে পাঠাতে চাই, সঙ্গে আমাদের দুজন লোক যাবে। জোরাণ্ডা বাংলো ছেড়ে একটু এগিয়ে লোক দুটো একটা জায়গায় নামবে। আপনারা এই দুজন লোক আর জিনিসটা নামিয়ে দিয়ে জোরাণ্ডা ডাকবাংলোতে ফিরে এলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কথার নড়চড় হলে বিপদে পড়বেন। আমরা যেমন করে পারি জঙ্গলের পথ দিয়ে পালিয়ে যাব। শুধু জিনিসটার জন্যেই যত ঝামেলা।'

'জিনিসটা কি' সন্তোষ জিজ্ঞাসা করলে।

'আপনাদের জানবার দরকার কি? যা বলছি তাই করুন?' কথাটা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে লোকটা।

ভয় বিস্ময়-কৌতূহলে সিদ্ধার্থরা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। সব ব্যাপারটা গাড়ির মধ্যে বসে লক্ষ্য করছিল।

এবার লোকগুলো জঙ্গল থেকে একটা লম্বা মতন চটে মোড়া কি যেন বার করে নিয়ে এল। বিরিঞ্চিও সেই অবসরে চট করে তার বন্দুকটা সিটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর জীপের পেছনের পর্দাটা অল্প সরিয়ে ওদের জিনিসটাকে ভেতরে তুলে নিলে।

বিরিঞ্চি লক্ষ্য করলে চটের গায়ে রক্তের ছোপ লেগে আছে। লোকটা অপর দুজনকে বলল, 'জগা, রাণা তোরাও গাড়ির পেছনে ওঠ্।'

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল বিরিঞ্চি, 'পেছনে অনেক জিনিস ঠাসা। ওদের বসতে অসুবিধে হবে। ওরা বরং ড্রাইভারের পাশে ভাল করে বসুক। সামান্য রাস্তা তো যাবে, আমি ভেতরেই বসছি কষ্ট করে।'

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কি জিনিস আছে ভেতরে?'

বিরিঞ্চি বলল, 'এই চাল, ডাল, আলু আর পেঁয়াজের বস্তা। তাছাড়া কিছু কাঠ আর কম্বলও ভর্তি হয়ে আছে। আমরা কনট্রাক্টরের লোক, ফরেস্ট বাংলোগুলোতে এই সব মাল সাপ্লাই করে থাকি।'

বিরিঞ্চির কথা ওরা বিশ্বাস করল। ভেবে দেখল ভেতরে মানুষ থাকলে এমনভাবে চারিদিক ঢাকা থাকত না, তাতে তো দম বন্ধ হয়ে যাবে! এ নিশ্চয় জিনিসপত্তরের জন্যেই ঢাকা।

সময় নষ্ট না করে লোকটা জগা আর রাণাকে তুলে দিল সন্তোষের পাশে। তাদের হুঁশিয়ার করে দিল, 'রিভলবারগুলো সাবধানে রাখিস, রাস্তায় নানারকম বিপদ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, দরকার হলে.....'

বিরিঞ্চিদেরও বলে, 'আপনারাও ঝামেলা করার চেষ্টা করবেন না। রাস্তায় আর আশেপাশের জঙ্গলে আমাদের গ্যাং ছড়িয়ে আছে। বেগোড়বাঁই করলেই বিপদে পড়বেন।'

সন্তোষ জীপ ছেড়ে দিল। পাশে বসে রিভলবার হাতে জগা

আর রাণা জীপের বাইরে দুপাশে লক্ষ্য রাখলে। এই ফাঁকে বিরিঞ্চি চুপিচুপি আবার নিজের বন্দুকটা বার করলে সিটের তলা থেকে। সিদ্ধার্থরাও ধীরে ধীরে প্রস্তুত হলো বিপদের মোকাবিলা করতে। সবাই চুপ করে বসে রইল কেবল সুযোগের অপেক্ষায়। আর চিন্তা করতে লাগল, কেমনভাবে এই উড়ো বিপদ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। সামনেই রাস্তার পাশের ঝোপটা ভীষণভাবে দুলে উঠল। পরমুহূর্তে সন্তোষ লক্ষ্য করলে, একটা বিরাট সম্বর ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে দু'লাফে রাস্তাটা পেরিয়ে বিপরীত দিকের জঙ্গলে প্রবেশ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত ছয়-সাতেক লম্বা বাঘও সম্বরটাকে তাড়া করতে গিয়ে ওদের জীপের সামনে ঠিকরে এসে পড়ল। দুপাশের রাস্তাটা এখানে ঘন শালের জঙ্গলে ঘেরা।

সন্তোষ পাকা হাতে দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাঘটাকে পাশ কাটিয়ে খুব জোরে বেরিয়ে যেতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না, গাড়িটাকে নিয়ে হেলে পড়ল একটা গাছের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার কেবিনে বসে থাকা লোক দুটোও জীপের একপাশের বন্ধ দরজার ওপর দড়াম করে গিয়ে পড়ল, আর ওদের হাত থেকে চকিতে রিভলবার দুটো ঠিকরে পড়ল একটা সন্তোষের পাশে, আর একটা দরজার ধারে। সমস্ত ঘটনাটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটে গেল।

সন্তোষ গাড়ি চালাতে চালাতেই তার পাশে পড়ে থাকা রিভলবারটা পা দিয়ে সরিয়ে কাছে টেনে এনে হাত দিয়ে তুলে নিল। পরক্ষণেই বাইরে চোখ পড়তেই দেখলে—বাঘটা ততক্ষণে গাড়ির ঐ অবস্থা দেখে দৌড়ে একটা নদীর ধারে পালিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থও অন্য রিভলবারটা নিয়ে নিল।

এরপর লোকদুটো যখন টাল সামলে নিজেরা আবার ঠিক হয়ে বসেই রিভলবার নিতে গেল, দেখল ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থরা ওদের ঘিরে ফেলেছে। এত নতুন লোকজন দেখে লোক দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। পরমুহূর্তেই সুযোগ বুঝে ওরা পালাবার চেষ্টা করতে যেতেই, বিরিঞ্চি হাতের বন্দুকটা উঁচিয়ে লোক দুটোকে বললে, 'পালাবার চেষ্টা করে বিপদের ঝুঁকি নিও না, তাহলে মাথার খুলি দুটো উড়িয়ে দেব। এবার বল থলের মধ্যে কি আছে?'

লোকদুটো বললে, 'জানি না।'

বিরিঞ্চি বললে, 'দাঁড়াও জানাচ্ছি' বলে থলের মোড়কটার কিছুটা অংশ ছুরি দিয়ে কাটতেই দেখা গেল হাতির দাঁত। বিরিঞ্চি আবার বলে, 'সনাতনবাবু, সিদ্ধার্থবাবু, লোক দুটোকে ভাল করে দড়ি দিয়ে বাঁধুন। হাত-পা সব বাঁধবেন। একটু আগেই বুড়িবালাম নদী ছেড়ে চলে এসেছি, সামনেই জোরাণ্ডা বাংলো। ওখানেই একটা ঘরে ওদের এই অবস্থায় ফেলে রেখে দেবো। তারপর ফেরার পথে যোশীপুর নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেবো। লোকগুলো যে জঙ্গলের চোরাচালানকারী দলের লোক তা তো বুঝতেই পারছি।'

সনাতন বিরিঞ্চিকে বললে, 'ডাঃ রায়ের কাছে শুনেছিলাম এই অঞ্চলে নাকি একটা চোরাচালানকারী দলের গ্যাং নানারকম বেআইনী কাজে লিপ্ত। আর এদের নেতা হচ্ছে একটা বড় ঘরের ছেলে, নাম রাজসিং। হয়তো এই গ্যাংটাই ওর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।'

বিরিঞ্চির কথায় সিদ্ধার্থরা এবার চার বন্ধুতে লোক দুটোকে কষে বেঁধে ফেললে। এদিকে সন্তোষ তখন এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আর অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে জীপটা চালিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরেই ওরা সবাই জোরাণ্ডা ডাকবাংলোতে এসে পৌঁছাল। বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর। নিস্তব্ধ নিঃঝুম দুপুরে ডাকবাংলোটা হঠাৎ যেন কলরবে মুখরিত হলো। রোদ্দুরের সতেজতায় সারা অঞ্চলটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। ছায়াঘন নিবিড় জঙ্গল। একটু দূরে বাংলোর চারদিকে বড় বড় শাল, মহুয়া আর ইউক্যালিপটাসের সমারোহ দেখে সিদ্ধার্থদের মন ভরে গেল, চোখও ঘুরিয়ে নিতে পারল না। ছিমছাম সুন্দর ডাকবাংলোটার পরিবেশ ওদের মুগ্ধ করে দিলে। যেন তুলিতে আঁকা। মাথায় অ্যাসবেসটসে ছাওয়া দুটো ঘর পাশাপাশি, তবে দেওয়ালটা ইঁটের গাঁথা, সিলিংটাও দেখবার মতো, কাঠের লম্বা টুকরো জুড়ে জুড়ে সারা সিলিংটা ঘেরা। একটা ডাইনিং রুম, তার লাগোয়া একটা বাথরুমও আছে, এছাড়া আর যা আছে তা হলো স্টোররুম আর কিচেন। তবে কিচেনটা বাংলোর বাইরে। এই পুরো বাংলোর চারপাশটা আবার চওড়া খালে ঘেরা, খালটা গভীরও খুব, কারণ কোনো বন্য জন্তু-জানোয়ার হঠাৎ বাংলোটায় যাতে একেবারেই না আসতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

ওদের জীপটা যখন বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল, বাংলোর ভেতর থেকে একটা লোক এসে এই ঘেরা খালটার ওপর একটা মোটা শক্ত কাঠের প্ল্যাটফরম পেতে দিলে। জীপটা এবার ওর ওপর দিয়ে পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই লোকটা কাঠটাকে তুলে নিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

সিদ্ধার্থরা অবাক হয়ে চারদিকটা দেখছিল। বিরিঞ্চি আর সন্তোষ তখন গাড়ি থেকে জিনিস নামাতেই ব্যস্ত। এদিকে হাত-পা বাঁধা লোকদুটো তখনও গাড়িতে পড়ে আছে।

হঠাৎ সিদ্ধার্থদের সামনে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা একটা লোক এসে হাজির হলো। দেখতে যেমন বেঁটে তেমনি কালো। দাঁত বার করে হেসে বললে, 'মু র‍্যাংগো, এই বাংলোরে কেয়ার টেকার অছি। আমি বিরিঞ্চিবাবু সন্তোষবাবুরে চিনি। মু বঙ্গলাও বলতে পারি।'

সিদ্ধার্থরা কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, বিরিঞ্চি এর মধ্যে বাংলোর ঘর থেকে বেরিয়ে র‍্যাংগোকে উদ্দেশ করে বললে,

'র‍্যাংগো বাঁ পাশের ছোটো ঘরটা আগে খুলে দে। ওখানে আমাদের দুটো লোক রাত্রে থাকবে।'

র‍্যাংগো ঘর খুলতে ভেতরে চলে গেল, এই ফাঁকে সিদ্ধার্থরা, সন্তোষ আর বিরিঞ্চির সাহায্যে জগা আর রাণাকে মুখ, হাত, পা বাঁধা অবস্থায় তাড়াতাড়ি অন্য ঘরটায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে। ঠিক হলো র‍্যাংগো অন্যকাজে চলে গেলে, ওদের দুটোকে আবার বাঁ পাশের ছোট ঘরে চালান করবে। র‍্যাংগো থাকে কিচেনের পাশের স্টোররুমে। ওরা র‍্যাংগোকে লোকদুটো সম্বন্ধে কিছুই জানাতে চায় না। তাই এত গোপনতা।"

র‍্যাংগো ছোট ঘরটা খুলে দিয়ে ফিরে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'বাবুরা আজ তো বাংলোয় থাকছেন, কালও কি থাকবেন? যদি না থাকেন তবে স্নান সেরে নিন তারপর লাঞ্চ সেরে, একটু বিশ্রাম করেই জীপে করে জঙ্গলের খানিকটা দেখে আসুন না। এখান থেকে মাত্র পাঁচ-সাত মাইল যাবার পরই আসল জঙ্গলটা পড়বে। তবে সঙ্গে বন্দুক রাইফেল নিয়ে যাবেন। আর সন্ধ্যে ছটার মধ্যেই ফিরে আসবেন। রাস্তাঘাটে বিপদ হতে আর কতক্ষণ! কাল থাকবেন না তো, তাই এই কথা বললাম।'

লাঞ্চ সেরে ওরা জঙ্গলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল, বেলা তখন তিনটে। সনাতন নিজের রাইফেলটা সঙ্গে নিলে, বিরিঞ্চিও নিলে ওর যোশীপুর থেকে আনা বন্দুকটা। সিদ্ধার্থ আর সন্তোষও লোকদুটোর কাছ থেকে পাওয়া রিভলবার দুটো নিলে।

সন্তোষ আর বিরিঞ্চি আগেই যোশীপুর ফরেস্ট অফিস থেকে লিখিত অনুমতিপত্র নিয়েছিল। লোকদুটোকে র‍্যাংগোর অজান্তে ছোট ঘরে চালান করে, তালা লাগিয়ে সকলে জীপে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। পুরোটাই পাহাড় কাটা কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ওপর পাথরের ছোট ছোট নুড়ি পড়ে আছে চারদিকে। সিদ্ধার্থরা যত জঙ্গলের কাছাকাছি এগোতে লাগল, দেখলে জীপের শব্দে শিংওয়ালা কিছু হরিণ সরু পায়ে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের আরও গভীরে।

রাস্তার ওপর ওরা একটা জংলী মতন লোককে দেখলে, ফিরছে জোরাণ্ডার দিকেই। ওর হাতে তীর-ধনুক ছিল। সিদ্ধার্থদের জীপটা দেখে হাত তুলে থামাল। বললে, 'তুমরা আর জঙ্গলের দিকে যেও নাই বাবুগো। একটু আগে আর একটা জীপ এখান দিয়ে চলে গেছে। ওর মধ্যে এক সাহেববাবু আর ডেরাইভার সাব ছিল। আমায় পালাতে বললে। আগের জঙ্গলে নাকি একটা পাগলা হাতি বেরিয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই মারছে। গাছ ফেলছে, মোটা ডালপালা ভাঙছে। তাই বাবু আপনারা আর ইগোবেন নাই, কখন বিপদ হবে কে জানে!'

এই কথা শোনার পর ওরা জঙ্গলের পথে আর না গিয়ে জীপ ঘোরাল জোরাণ্ডায় ফিরে আসবে বলে। বেশ খানিকটা পথ ফিরে আসবার সময় রাস্তায় আর একটাও জনপ্রাণী দেখা গেল না। এতক্ষণ জীপ চালিয়ে সন্তোষ খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই এবার ড্রাইভিং-এর দায়িত্ব নিলে বিরিঞ্চি। বাংলোর মধ্যে ঢুকে জীপটা একপাশে রাখতেই সিদ্ধার্থরা আর সন্তোষ সবাই নেমে পড়ল। সনাতন বিরিঞ্চিকে বললে, 'আমি আর একবার বেরোতে চাই, খুব দরকার আছে। আমি নিজেই ড্রাইভ করব, আপনার দরকার লাগবে না।'

বিরিঞ্চি বুঝতে পারে না সনাতনের ব্যাপারটা। শুধু বলে, 'সাবধানে যাবেন, শহরের লোক আপনারা জঙ্গলের অভিজ্ঞতা তো নেই।' সিদ্ধার্থরা অবাক হয়ে যায় সনাতনকে গাড়ি চালাতে দেখে, সনাতন যে গাড়ি চালাতে জানে একথা তো ওরা আগে কোনও দিন জানত না!

জীপেতে ফিরে আসবার সময় সিদ্ধার্থরা ঠিক করেছিল, কাল সকালেই ওরা চাওলা ডাকবাংলোর দিকে রওনা দেবে। এখান থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল পথ। রাতটা ওখানেই কাটিয়ে পরের দিন যোশীপুর আবার ফেরা যা মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা। ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় লাগবে ফিরতে। যোশীপুরে লোক দুটোর একটা ব্যবস্থা করে আবার বাসে করে কলকাতা ফেরা। এই রাস্তাটা পেরিয়ে আসতে প্রায় ঘণ্টা আষ্টেক সময় লাগবে।

প্রায় আধঘণ্টার মতো সময় লাগল সনাতনের ফিরে আসতে। সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরি নেই, কারণ জঙ্গলে দিনের আলোটা একটু আগেই ফুরিয়ে যায়। সনাতন ফিরে আসবার সময় একটা রাস্তায় বাঁক নিতেই শুনতে পেল হরিণের করুণ চিৎকার, শব্দ লক্ষ্য করে রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল একটা করুণ দৃশ্য—দেখলে একটা চিতাবাঘ সবেমাত্র একটা হরিণ ধরে এনেছে খাবে বলে। ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরেছে সবে, তখনও হরিণটার পাগুলো নড়ছিল। এই সুযোগ, সনাতন কাছ থেকে চিতাটার পায়ে পরপর দুটো গুলি করলে, চিতাটা প্রথম গুলি খেয়ে শিকার ছেড়ে সনাতনকে তেড়ে এল, কিন্তু পরের গুলিটা আবার একই পায়ে করতে পালিয়ে গেল। জীপ থেকে নেমে হরিণটাকে আহত অবস্থায় জীপে তুলে নিয়ে এলো সনাতন। তারপর ওর চিকিৎসার জন্য বাংলোর ভেতরে গেল ওষুধ আনতে।

রাত বাড়তে লাগল। জোরাণ্ডা ডাকবাংলোর চারদিকটা রাতের বেলা বিভীষিকায় ভরা। অন্ধকারে গাছগুলোকে দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে ঘন কালো অমাবস্যার আকাশের ফুটফুটে তারাগুলো উঁকি মারছে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সুর পরিবেশটাকে আরও থমথমে আর রহস্যময় করে তুলেছে। মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল থেকে বাঘ-হাতির ডাকও শোনা যাচ্ছিল।

সিদ্ধার্থদের রাতের খাওয়া শেষ। র‍্যাংগো ডাইনিং টেবিল থেকে কাচের বাসনগুলো নিয়ে গেল ধোয়ার জন্য। আর রেখে গেল দুটো খাবারভর্তি প্লেট জগা আর রাণার জন্য। র‍্যাংগো চলে গেলে বিরিঞ্চি আর সন্তোষ লোক দুটোর জন্য খাবার নিয়ে ওদের ঘরে গেল। একটু আগেই ওরা লোক দুটোকে আবার বাঁ পাশের এই ছোট ঘরেই চালান করেছিল।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই বিরিঞ্চি হাতের বন্দুকটা ঠিক করে নিলে। সন্তোষ হাতের থালা একপাশে রেখে ওদের হাত-পা আর মুখের বাঁধন খুলে দিলে। এতক্ষণ বাঁধার জন্য হাত-পায়ের রক্ত চলাচল ঠিকমতো না হওয়ায় ওদের উঠে দাঁড়াতে প্রথমটা খুব কষ্ট হচ্ছিল। ঝিমঝিম করছিল মাথাটা। প্রথমে জগাকে পাশের বাথরুমে নিয়ে গেল সন্তোষ, বিরিঞ্চি তখন রাণাকে পাহারা দিচ্ছে, পরে জগা ফিরে এলে রাণাকে নিয়ে যাওয়া হলো। সন্তোষের হাতে তখন খোলা রিভলবার ধরা। একটু এদিক ওদিক হলেই দেবে শেষ করে।

বাথরুম সারা হয়ে গেলে ওদের দুটোকে ঘরে এনে খাবারের প্লেট দুটো দেওয়া হলো। খাওয়া চুকে গেলে, ওদের মুখটা খুলে আবার হাত-পা বেঁধে ছোট্ট ঘরটার মধ্যেই রেখে দেওয়া হলো। ঘরে তালাবন্ধ করে সন্তোষ আর বিরিঞ্চি ডাইনিং রুমটাতেই শোবার বন্দোবস্ত করলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, হঠাৎ বাংলোর বাইরে দুটো জন্তুর দুরকম ডাক শোনা গেল আর তার সঙ্গে ধপাধপ আওয়াজ। নবেন্দু আর ভবানীর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ওরা বিছানা থেকে উঠে টর্চটা নিয়ে জানলার ধারে এসে আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলে, অন্ধকারে কতকগুলো জ্বলন্ত চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা সিদ্ধার্থ আর সনাতনকেও বিছানা থেকে তুলে দেখালে। সনাতন বললে, 'এগুলো বাঘের চোখ বলেই মনে হচ্ছে!'

নবেন্দু সনাতনের কথা শুনে জঙ্গলের দিকে টর্চ ফেলতেই দেখলে, সত্যি কতকগুলো বাঘ মাটি চেটে চেটে কি সব জিনিস খাচ্ছিল বাংলোর সামনের জঙ্গলটায়। টর্চের আলো পড়তেই এক নিমেষে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলে। একটা হাতিও ছিল ওদের মধ্যে, সেটা কিন্তু পালাল না। মনের সুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটি খাচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে।

নবেন্দু টর্চ নিবিয়ে আবার ফিরে গেল শুতে। ওকে অন্য বন্ধুরাও অনুসরণ করলে। ওদের হৈচৈতে বিরিঞ্চি আর সন্তোষের ঘুম ভেঙে গেল। সিদ্ধার্থদের জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপারটা কি?' সিদ্ধার্থরা জানতে চায় এইভাবে জন্তুদের এইখানে মাটি চাটার কারণটা কি?

সনাতন এবার বললে, 'ও এই কথা, শোন্, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজনেরা এই বাংলোর ঐ জায়গাটায় মাটির সঙ্গে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে দেয় পশুদের খাবার জন্য। পশু প্রতিপালন করার এটা সরকারের সৎ প্রচেষ্টা বলতে পারিস। তাই রাতে পশুরা অন্ধকারে এই নুনমাটি খেতে আসে।'

খানিকটা সময় কেটে গেছে! রাত বেশ নিশুতি। হঠাৎ জঙ্গলের দিক থেকে বিকট একটা অজানা শব্দ ভেসে এল। বিরিঞ্চির ঘুম আসছিল না, ও সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কিসের ডাক বল তো? কোনোও জন্তুর ডাক নাকি রে?'

চিতাবাঘ হরিণ ধরেছে

'কি জানি! কোনও পাখির ডাকও হতে পারে'—সন্তোষ উত্তর দিল।

আবার শব্দটা ভেসে এল জঙ্গল থেকে—তারপরেই একই রকম শব্দ বাংলোর ছোট ঘর থেকেও শোনা গেল যেখানে রাণা আর জগা ছিল। বিরিঞ্চি আর সন্তোষ অন্ধকারের মধ্যেই চুপিচুপি ওদের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলে, ওদের একজন জানলার ধারে গিয়ে আবার ডেকে উঠল মুখে আঙুল দিয়ে। কি অদ্ভুত একটা আওয়াজ! বিরিঞ্চি সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো ভেতরে ফেলতেই লোকটা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

আবার ওদিক থেকে ডাক এল। বিরিঞ্চি আর সন্তোষ বুঝতে পারলে, বাইরে ওদের দলের লোক নিশ্চয় জানবার চেষ্টা করছে জগা আর রাণা এই বাংলোয় আছে কিনা। তাছাড়া চোরাচালানকারী দলের লোকগুলো যখন জগা আর রাণাকে মাল নিয়ে ফিরতে দেখেনি, তখনই সন্দেহ করেছিল যে এই ডাকবাংলোতে ওরা থাকতে পারে। কারণ বিরিঞ্চি আর সন্তোষও সেই কথা বলেছিল ওদের। তবে ওদের জানা ছিল না যে বিরিঞ্চিদের সঙ্গে সিদ্ধার্থরাও আছে।

এদিকে বিরিঞ্চি সিদ্ধার্থদের সব ব্যাপারটা জানালে ওরাও অন্ধকারে সকলে বাংলোর মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল অজানা বিপদের মোকাবিলা করবে বলে।

হঠাৎ বাইরে থেকে অনেক লোকের একসঙ্গে চিৎকার, 'জগা রাণা, বেরিয়ে আয়। আমরা এসে গেছি।' সঙ্গে সঙ্গে একটা জীপের আওয়াজ শোনা গেল। ভেতর থেকে জগা, রাণা উত্তর দিলে 'বস্ আমাদের হাত-পা সব বাঁধা, ছোট.....' কথাটা শেষ হবার আগেই জগা লাথি খেল জোরে, আর রাণা খেল চড়। আচমকা মারের চোটে ঠিকরে পড়ে গেল দুজনে।

সনাতন আর সিদ্ধার্থ কখন যে ওদের ঘরের দরজা খুলে

চুপিচুপি ঢুকে পড়েছিল, লোক দুটো খেয়ালই করেনি। এবার সিদ্ধার্থরা ওদের দুজনের মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলে, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

অন্ধকারের মধ্যে চোরাচালানকারী দলের লোকগুলো কি করছে দেখবার জন্য সনাতন বাংলোর বাইরে টর্চ ফেলতেই চমকে উঠল, দেখলে সেই আগের দেখা দাড়িওলা লোকটা একটা রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। সনাতন বারবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে দেখছিল সময়টা কত। ওকে খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়তে হয়েছে। একবার নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'কি হলো এত দেরি হচ্ছে কেন ওদের?'

সিদ্ধার্থ সনাতনের কথাটা একটু শুনতে পেল।—'কিরে সনাতন? কাদের কথা বলছিস?'

সনাতন বলে, 'না না, ও কিছু নয়। সিদ্ধার্থ, তুই আর একবার টর্চটা ফ্যাল তো জঙ্গলটাতে।'

টর্চের আলো ফেলতেই, দাড়িওলা লোকটা টর্চের আলো লক্ষ্য করে সেই দিকের জানলায় গুলি করলে— গুড়ুম। বাংলোর জানলার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। একটুখানির জন্যে সন্তোষ, সিদ্ধার্থ আর সনাতন বেঁচে গেল। সনাতনও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিল রাইফেলের গুলিতে—গুড়ুম। লোকটা চকিতে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থরা এবার বাংলোর বাইরে চারিদিকটা টর্চ ঘুরিয়ে দেখলে—সারা বাংলোটা ঘিরে ফেলেছে গ্যাংটা। বারো-তেরজন লোক বাংলোটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, সবাইকার হাতেই রাইফেল। চওড়া খালটা মাঝখানে থাকার জন্য ভেতরে আসতে পারছে না।

সনাতন বললে, 'এক কাজ করা যাক। সন্তোষ আর বিরিঞ্চি, তোমরা ভাই বাংলোর সামনের দিকটা লক্ষ্য কর। মনে হচ্ছে এবার ওরা খালটা সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করবে। যেই করবে তোমরা অমনি গুলি চালাবে। ঠিক সেই রকম আমি আর সিদ্ধার্থও বাংলোর পেছনের বাইরে লক্ষ্য করব। দরকার হলে আমরাও গুলি চালাতে কসুর করব না। তাছাড়া একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে, গুলির আওয়াজ পেলেই পুলিশ জানতে পারবে জোরাণ্ডার অবস্থা। শত্রুপক্ষকে কিছুতেই বুঝতে দেওয়া চলবে না যে আমাদের অস্ত্র বলতে আছে মাত্র একটা বন্দুক, একটা রাইফেল আর দুটো রিভলবার, যা ওদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে!

র‍্যাংগো ওর ঘরে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। গুলির আওয়াজ আর চিৎকার-চেঁচামেচিতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। কি করবে বুঝতে পারে না, হঠাৎ একটা খসখস আওয়াজ ওর কানে গেল। ও এবার সচেতন হলো। আওয়াজটা লক্ষ্য করলে। আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখলে একটা লোক, ওরই ঘরের পিছনে, খালের ধারে একটা ঝোপের আড়ালে সাঁতরে এসে লুকিয়ে বসল। অন্ধকারে চেনাও গেল না, বোঝাও গেল না লোকটাকে

ভয়ে জড়সড় হয়ে র‍্যাংগো নিজের ঘরে বসে রইল, আর চারদিকের অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগল। একটু পরেই শুনতে পেলে ওকে যেন কে ডাকছে, 'র‍্যাংগো, র‍্যাংগো আমি। তোর ঘরের দরজাটা খুলে দে। আমি থানা থেকে আসছি।'

র‍্যাংগো লোকটাকে চিনতে পারে না, কিন্তু ওর হাতে বন্দুক দেখে ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজাটা খুলে দেয়। লোকটা র‍্যাংগোর ঘরে ঢুকে পড়ে। র‍্যাংগো দেখলে, ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে, সারা শরীরের সঙ্গে পোশাকটা ভিজে জবজব করছে।

র‍্যাংগোকে ইশারা করে ভদ্রলোক বলে, 'চুপ, এরা রাজসিংএর গ্যাং বুঝলি? ওদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। শুধু এফটুখানি চালে ভুলে করে ফেলেছি বলে দেরি হচ্ছে।'

র‍্যাংগো রাজসিংএর নাম আগে শুনেছে ডাকাত দলের সর্দার বলে। তবে কখনও দেখেনি তাকে। র‍্যাংগোর ধারণা হলো এই ভদ্রলোক নিশ্চয় পুলিশের লোক।

রাজসিং মানে গ্যাং লিডার, হয়তো দাড়িওলা লোকটাই হবে। এর দলবল সাঁতরে আসা ভদ্রলোককে হয়তো নিজেদের দলের লোক বলে মনে করে সন্দেহ করেনি! দাড়িওলা লোকটা এবার ডাকবাংলোটা আক্রমণ করল রাইফেলের গুলি চালিয়ে—গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম। সঙ্গের কিছুলোক সাঁতরে পেরবে বলে খালে নেমে পড়ল। সিদ্ধার্থরাও পালটা গুলি চালাতে লাগল নেমে পড়া লোকগুলোকে লক্ষ্য করে।

এই অবস্থায় হঠাৎ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। বন-বাদাড় কাঁপিয়ে একটা পাগলা হাতি দুরন্ত গতিতে কোথা থেকে দৌড়ে এসে দাড়িওলা লিডার গোছের লোকটাকে আচমকা শুঁড়ে করে জড়িয়ে আছড়ে ফেলল এক নিমেষে, এক আছাড়েই লোকটার ভবলীলা সাঙ্গ। দলের অন্যান্য সঙ্গীরা, ঘটনাটা হঠাৎ এরকম ঘটে যাওয়ায় হতচকিত হয়ে গেল। পাগলা হাতিটা তখন মদমত্ত অবস্থায় সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই মারছে। লোকগুলো বাংলো থেকে জগা, রাণাকে বাঁচাবার কথা ভুলে যে যার নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। কোনদিকে পালাবে ঠিক করতে না পেরে কেউ কেউ প্রাণপণ শক্তিতে ঝপাঝপ খালের মধ্যে ঝাঁপ দিলে। কেউ কেউ আবার জঙ্গলের মধ্যে পালাতে লাগল।

গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম— র‍্যাংগোর ঘর থেকে কে যেন গুলি ছুঁড়লে! পাগলা হাতিটা গুলির আওয়াজে থমকে গেল একবার, পরক্ষণেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা দাঁড়িয়ে থাকা জীপকে রাগের চোটে উলটে দিলে হাতিটা। সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাংগোর ঘর থেকে এক ভদ্রলোকের চিৎকার শোনা গেল, 'সনাতনবাবু আপনার কথা মতো আমরা এসে গেছি। আপনারা এক্ষুণি রাণা-জগাদের দলের কাছ থেকে উদ্ধার করা হাতির ভাঙ্গা দাঁতটা ছুঁড়ে খালের ওপারের জঙ্গলে হাতিটার সামনে ফেলে দিন।'

ভদ্রলোকের কথায় সিদ্ধার্থরা সবাই মিলে হাতির দাঁতটা ঘর থেকে ধরাধরি করে এনে পাগলা হাতিটার সামনে ছুঁড়ে ফেলে

দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাতিটা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর শুঁড় দিয়ে দাঁতটাকে জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে যেন জয়ের গৌরব নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সকলে ব্যাপারটা দেখে তাজ্জব বনে গেল।

সনাতন বললে, 'হাতিটা কেমন অদ্ভুত ব্যাপার করলে দেখলি তোরা। কিন্তু এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জীপ এল কোথা থেকে!' চিন্তা করতে করতে খানিকটা সময় কেটেছে, হঠাৎ একটু আলোতে দেখা গেল, দুটো জীপ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বাংলোর সামনে দাঁড়াল। আকাশ তখন একটু একটু ফিকে হয়ে আসছে। দেখা গেল, দুটো জীপই ফরেস্ট রিসার্ভ পুলিশের। প্রায় তের-চোদ্দটা লোককে ধরে আনা হয়েছে। জীপ থেকে নেমে একজন পুলিশ অফিসার পুলিশদের অর্ডার করলে, 'খালের ধারে লুকিয়ে থাকা গ্যাংএর বাকি লোকগুলোকে সব অ্যারেস্ট করে জীপে তোল।' তারপর সিদ্ধার্থদের বেরিয়ে আসতে দেখে সনাতনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'স্যার আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি তো? আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে যদিও, আমি কিন্তু গ্যাংএর বেশির ভাগ লোকগুলোকে ধরে এনেছি, আর বাকিটা এখানে ধরা হলো।'

সনাতন হাসতে হাসতে বললে, 'মিঃ মোহান্তি, আমি ফরেস্টার হয়ে এসে প্রথমেই যে আপনাদের এতটা সাহায্য পাব চিন্তাই করিনি। কিন্তু শুনেছিলাম উড়িষ্যা সরকারের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কে এক এক্সপার্ট বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার নাকি ভুবনেশ্বর থেকে এই গ্যাংটাকে রাজসিংএর গ্যাং মনে করে, ধরবার ব্যাপারে ইনভেসটিগেশনে আসছেন, তাঁর কি হলো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মিঃ সৌরভ সোমের কথা বলছেন তো, তিনি তো আমাদের আগেই এখানে চলে এসেছেন, ওঁর রাইফেলের আওয়াজ আগেই শুনেছি, তাছাড়া আজকের এই গ্যাং অপারেশনের তিনিই তো উদ্যোক্তা। দেখি কোথায় তিনি।'

'আর দেখতে হবে না, হ্যাঁ, অনেক আগেই এসে গেছি মিঃ মোহান্তি। একটু বেকায়দায় পড়ে অন্য উপায় করতে হয়েছিল। আগে চলুন তো দেখি রাজসিংএর বডিটা সনাক্ত করি।'

মিঃ মোহান্তি বললেন, 'এই যে বডিটা এখানে পড়ে আছে। দেখুন সারা মুখটা থেঁতলে রক্তে লাল হয়ে গেছে। কি বীভৎস চেহারা!' মিঃ সোম পকেট থেকে একটা ফটো বার করে মিলিয়ে নিলেন, সত্যিই রাজসিংএর বডি প্রমাণ হলো।

মিঃ সোম আবার বলতে লাগলেন, 'রাজসিংএর লোকগুলো আমার আগে যে জঙ্গলে এসে যাবে আমি বুঝতে পারিনি। আমার জীপটাকে হঠাৎ ওরা পেছন থেকে অ্যাটাক করে। আমি জীপটা ফেলে পালিয়ে যাই অন্ধকারে। তবে পাগলা হাতিটাই শেষ পর্যন্ত আমার সুবিধে করে দেয়।'

সনাতন অবাক হয় মিঃ সোমকে দেখে। বলে, 'আরে, আপনি তো বাসে পরিচয় দিয়েছিলেন ত্রিলোচন মোহান্তি বলে, মনে

রাণা খেল এক চড়

পড়ে?'

'হ্যাঁ ঠিক কথা, কই আপনিও তো আমাকে আপনার আসল পরিচয় দেননি। মনে পড়ে আমি বলেছিলাম, আবার দেখা হবে। তাছাড়া আপনার বন্ধুরাও তো জানত না যে আপনি এখানে নতুন ফরেস্ট অফিসার হয়ে আসছেন।'

'তা সত্যি, আমি ওদের একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।'

'বলতে পারেন—আমিও তাই, আমি আপনাদের সব খবরই রেখেছিলাম। আপনার সম্বন্ধেও পরে এখানে এসে জেনেছি। অনেকদিন ধরেই রাজসিংকে ধরবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারা যাচ্ছিল না। আজ সেটা সম্ভব হলো একটা পাগলা হাতির জন্য। একটা জিনিস জানবেন, হাতি শত্রুকে জীবনে কোনও দিন ভোলে না। আর যেখানে দেখে সেখানেই প্রতিশোধ নেয়।

রাজসিং নিজে যে হাতিটাকে মেরে দাঁতটা নিয়েছিল সেটি পুরুষ হাতি। ওর সঙ্গিনী হাতিটা সব দেখেছিল। তখন ও প্রতিশোধ নিতে পারেনি, কিন্তু চিনে রেখেছিল। আজ রাজসিংকে মেরে আর দাঁতটা ফিরে পেয়ে ও প্রতিশোধ নিয়ে চলে গেল। ভগবানের মার কে আটকাবে বলুন? আমি এখানে এসে দুদিন চাওলা ডাকবাংলোতে ছিলাম। পরিচয় দিয়েছিলাম নতুন ফরেস্টার বলে।'

সিদ্ধার্থরা আর সন্তোষ বিরিঞ্চি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে মিঃ সোমের কথাগুলো শুনছিল। সনাতন এবার সকলকে ডেকে নিয়ে গেল ওর চড়ে আসা জীপটার কাছে। সকলে দেখলে একটা আঘাত-পাওয়া হরিণ জীপের মধ্যে ঝিমোচ্ছে। সনাতন বললে, 'আমি ওকে ইতিমধ্যে ইনজেকশন দিয়েছি। আশা করছি হরিণটা বেঁচে যাবে। ওকে একটা চিতার মুখ থেকে বাঁচিয়েছি। এইটা আমার চাকরির প্রথম সাফল্য।'

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। মিঃ সোম আর মোহান্তি জীপে করে সব গ্যাংটাকে ধরে নিয়ে গেল যোশীপুরে, রাণা জগাও বাদ যায়নি। সিদ্ধার্থরা জীপে উঠল চাওলা ডাকবাংলোয় যাবে বলে।

ছবি: প্রসাদ রায়

# হাঁদা-ভোঁদার

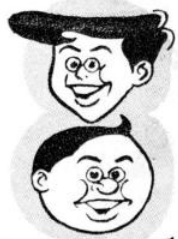

## ল্যাসোর প্যাঁচ

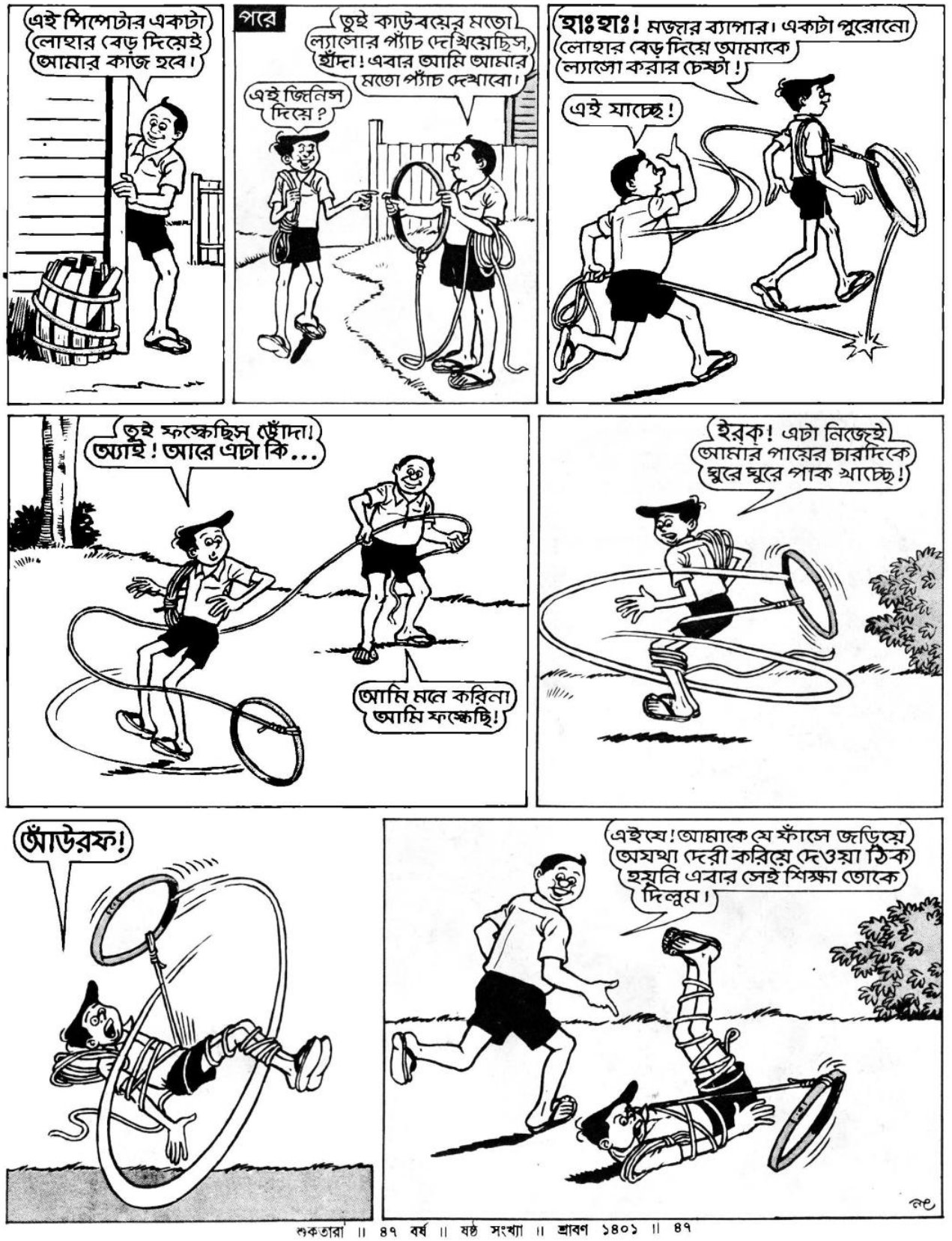

এই পিপেটার একটা লোহার বেড় দিয়েই আমার কাজ হবে।
পরে
তুই কাউবয়ের মতো ল্যাসোর প্যাঁচ দেখিয়েছিস, হাঁদা! এবার আমি আমার মতো প্যাঁচ দেখাবো।
এই জিনিস দিয়ে?
হাঃ হাঃ! মজার ব্যাপার। একটা পুরোনো লোহার বেড় দিয়ে আমাকে ল্যাসো করার চেষ্টা!
এই যাচ্ছে!
তুই ফস্কেছিস ভোঁদা! অ্যাই! আরে এটা কি...
আমি মনে করিনা আমি ফস্কেছি!
ইরক! এটা নিজেই আমার পায়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে!
আঁউরফ!
এইযে! আমাকে যে ফাঁসে জড়িয়ে অযথা দেরী করিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি এবার সেই শিক্ষা তোকে দিলুম।
নচ

নিতাইলাল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

# শিক্ষা

## সবিতা হালদার

সবে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষা বেশ ভালোই দিয়েছি। পাশ যে করবই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেইজন্য মনটা বেশ ফুরফুরে। তার উপর আবার নববর্ষ এলো বলে। আর মাত্র দু'দিন বাকি। নববর্ষে কি কি কেনাকাটা করব সেই সব চিন্তা করতে করতে দুটো দিন পেরিয়ে গেল। এলো শুভ নববর্ষ। সকালে উঠে স্নান করে বাবার দেওয়া নতুন জামা পরতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবার দেওয়া জামাটা আমার একদম পছন্দ হয়নি। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। মা আমাকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে। কারণটা বলতে মা বললেন, তিনি আমাকে আরেকটা জামা কিনে দেবেন। দু'জনে বাজারে গেলাম। অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা বেশ দামী জামা আমার পছন্দ হলো। মা সেটাই কিনে দিলেন। এবার বেশ খুশি মনে মার সঙ্গে বাড়ির পথে রওনা হলাম।

ফিরে এসে দেখি আমাদের কাজের মেয়ে নগমা যে কিনা সদ্য সাক্ষর হয়েছে, আশেপাশের বাড়ির সাত-আটজন কাজের ছেলে মেয়ে বউদের আমাদের বাড়ির উঠোনের মাঝে পড়াতে বসেছে। আমাকে ও মাকে ঢুকতে দেখে নগমা ধীর কণ্ঠে বলল, মাসীমা, আজ আপনারা কেউ ছিলেন না বলে আমি বাড়ি ছেড়ে

না গিয়ে এদের এখানেই ডেকে এনেছি। অন্যায় করিনি তো? নগমার কথা শুনে আমি বললাম, এইবার বুঝতে পারলাম তুই রোজ নটার সময় ছুটি নিয়ে কোথায় যাস। নগমা উত্তর দিল, লেখাপড়া না জানার কষ্ট আমি তো জানি তাই নিজে যা শিখেছি এদের শেখাচ্ছি। এতে আমার নিজেরও সব কিছু মনে থাকবে আর এরাও কিছু শিখবে। আর এদের শেখাতে শেখাতে আমিও নতুন কিছু শিখব।

নগমার কথায় আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। কই এতদিন আমার মনে তো কখনও এসব কথা উদয় হয়নি। আমি আমার হাতে ধরা নতুন জামার প্যাকেট মাটিতে ফেলে নগমার হাত দুটো ধরে বললাম, নববর্ষে আমাকে অনন্য এক শিক্ষা দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। নববর্ষের অমূল্য উপহার হিসাবে চিরকাল এটা আমার মনে থাকবে।

নিতাইলাল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

# উপহার

## অরিন্দম মণ্ডল

গত বছর আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই হরিপদবাবু নববর্ষের আগের দিন আমাদের বললেন, দেখ, আমি কাল তোমাদের জন্যে দশ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করেছি। তোমরা অবশ্যই নাম দেবে। কারণ যারা দৌড় সম্পূর্ণ করতে পারবে সন্ধ্যেবেলায় তাদের সকলকে বিশেষ উপহার দেওয়া হবে।

আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম। কষ্ট হলেও মোটামুটি সকলেই দৌড় সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলাম। উপহার পাওয়ার জন্য আমরা তো ছটফট করছি। তখন স্যার আমাদের বললেন, তোদের উপহার এখানে নেই। অন্য জায়গাতে আছে। স্যার আমাদের একটা স্কুলের সামনে নিয়ে এলেন। দেখলাম সেখানে চেয়ার পেতে বসে আছে বেশ কিছু মাঝবয়েসী আর বৃদ্ধ মানুষজন। তাদের বেশবাস খুবই মলিন। আমরা তো অবাক! এই সন্ধ্যেবেলা উপহারের জন্য এইসব মানুষদের কাছে নিয়ে আসা হলো কেন? তবে কি কোনো মন্ত্রী আসবেন? আমাদের কি বক্তৃতা শোনার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে? বিরক্ত হলাম সকলে। উপহারের নামগন্ধ নেই, উল্টে এসব! থাকতে না পেরে স্যারকে জিজ্ঞেস করি, আপনি যে বলেছিলেন উপহার পাব?

এদের সবাইকে পড়াতে হবে

স্যার বললেন, এদের সবাইকে পড়াতে হবে, এই হচ্ছে তোমাদের উপহার। আমাদের মুখে কথা সরে না। এটা উপহার কেমন করে হয়? স্যার তখন আমাদের বললেন, দেখ, তোমরা যদি একজনকেও নিরক্ষর থেকে সাক্ষর করতে পারো তাহলে সেটাই হবে তোমাদের পরম পাওয়া। ভেবে দেখ যখন বলা হবে আমাদের দেশে শিক্ষার হার এত শতাংশ, তখন তোমাদের নামও অলিখিত ভাবে থাকবে কিনা? আমরা স্যারকে বললাম, হ্যাঁ স্যার, আমরা পড়াব। এই হলো আমাদের নববর্ষের আলোতে শপথ, নববর্ষের উপহার।

ছবি: সৃফি

এ ছাড়া যাঁদের লেখা ভালো হয়েছেঃ

সম্রাট ঘোষ (দুর্গাপুর, বর্ধমান)।। তৃপ্তি ঘোষ (আর. এন. টেগোর রোড, কলিকাতা-৭৭)।। কথাকলি রায় বর্মন (কৃষ্ণনগর, আগরতলা)।। রুমা খান (আমতলা স্কুল পাড়া, মুর্শিদাবাদ)।। মানবেন্দ্রনাথ মৈত্র (রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি)।। সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় (চকভৃগু, দক্ষিণ দিনাজপুর)।। তিমিরবরণ চঁদ (গুসকরা, বর্ধমান)।। আশোককুমার প্রধান (আন্দুল, হাওড়া)।। প্রতিমা রুদ্র (শ্রীগোপালপুর, বর্ধমান)।। বাদলচন্দ্র মণ্ডল (পাণ্ডুয়া, হুগলী)।।

## বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক এবং বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র, তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই-বিশেষ পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এই মাসের পুরস্কার প্রাপকরাঃ

সবিতা হালদার, অরিন্দম মণ্ডল, সম্রাট ঘোষ, তৃপ্তি ঘোষ ও কথাকলি রায় বর্মন।

## ঘোষণা

মানবাজার, পুরুলিয়া থেকে মিহির সেন, নেপালচন্দ্র সেন ও আনন্দময় সেন তাঁদের প্রয়াত পিতা অম্বুজাক্ষ সেনের নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকদের কাছ থেকে অম্বুজাক্ষ সেন স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

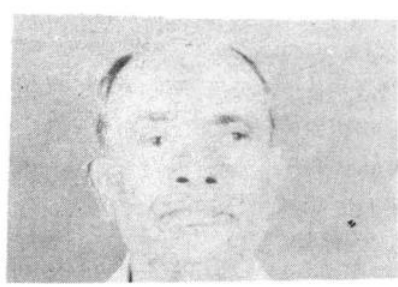

বিষয়বস্তু

সত্যের জয়

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ ভাদ্র

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার পৌষ সংখ্যায় ছাপা হবে।

অম্বুজাক্ষ সেন
জন্মঃ ১২ অগ্রহায়ণ ১৩২৭
মৃত্যুঃ ১৬ শ্রাবণ ১৩৯৭

প্রথম পুরস্কারঃ ১০০ টাকা।। দ্বিতীয় পুরস্কারঃ ৫০ টাকা।

## ভোজবাজি

যে লোকটি চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে বিখ্যাত হতে পারতেন সেই লুই লে প্রিন্স ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের একটা ট্রেনের কামরা থেকে আশ্চর্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ওই বছরের গোড়ার দিকে প্যারিসের অপেরা হাউসে তিনি দেখিয়েছিলেন তাঁর পদ্ধতি অবলম্বন করে কিভাবে চলচ্চিত্র তৈরি করা যায়। পেটেন্ট নেওয়ার ব্যাপার-ট্যাপার সব ঠিকঠাক, সামনে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত, ঠিক সেই সময় তিনি ট্রেনে চেপে বসলেন। আর নামলেন না। সাত বছর বাদ সরকারী-ভাবে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হলো।

# সত্যি !

### ওটা কি দানব ?

হাউ. এফ. ও. অবতরণের বেশ ভয়াবহ বিবরণী দিয়েছিল পশ্চিম ভার্জিনিয়ার একদল কিশোর-কিশোরী। এরা থাকত ফ্ল্যাটউডস নামক অঞ্চলে। ১৯৫২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলা সকলে দেখে কাছেই পাহাড়ের মাথায় একটা উল্কা এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীরা দল বেঁধে চলল উল্কা খুঁজতে। তাদের

সঙ্গ নিলেন একজন প্রতিবেশিনী, তাঁর দুই ছেলে ও একজন পুলিশ। পাহাড়ে উঠে তারা দেখতে পেল একটা পেল্লায় গোলক। সেটা একটা বাড়ির মতো প্রকাণ্ড। তার ভেতর থেকে বেরুচ্ছে সাপের মতো হিসহিস শব্দ। তার সঙ্গে ধকধক আওয়াজ। ওদের মধ্যে একজনের হঠাৎ নজর পড়ল গাছের ডালে দুটো চোখ জ্বলছে। কোনো জন্তুটন্তু হবে মনে করে সেদিকে টর্চের আলো ফেলতেই ভয়ে সকলের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তারা দেখল দশ থেকে পনেরো ফুট লম্বা পেল্লায় এক মূর্তি রক্তের মতো লাল মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সবজে কমলা চোখ অন্ধকারে জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। আতঙ্কে যখন দলটা হিম ঠিক তখুনি দানবটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে খুব ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আর কি কেউ থাকে সেখানে! তড়িৎবেগে পিছনে ফিরেই দে ছুট। পরে দেখা গিয়েছিল যে জায়গায় 'উল্কা'টা পড়েছে সেখানকার ঘাস চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে একটা বড় গোল বৃত্ত তৈরি করেছে। পাওয়া গিয়েছিল দুটো সমান্তরাল দাগ, যেন কিছু হড়কে চলেছিল দাগ ধরে। আর বাতাসে কেমন যেন একটা হালকা গন্ধ।

## ডবল এরিক

এরিক ডবলু স্মিথ শেফিল্ডের উপকণ্ঠে এক নিরালা অঞ্চলে বাস করতেন। তাঁর বাড়ির পিছন দিকের বনটাতে অনেকেই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। তাই শেফিল্ড সেখানে যেতেন টমাটো গাছের সার হিসাবে ঘোড়ার মল সংগ্রহ করতে। একদিন. বনে ঢুকে শেফিল্ড দেখলেন উল্টোদিক থেকে আরেকজন লোক আসছে। সে-ও তাঁর মতো একই কাজে ব্যস্ত। দুজন কাছাকাছি এসে একটা বেঞ্চে বসলেন। তখন শেফিল্ড দেখেন হুবহু তাঁর ব্যাগের মতো একটা ব্যাগ লোকটার হাতে। এমনকি মল তোলার জন্য ডাস্টপ্যানও। শেফিল্ড এবার পকেট থেকে তামাক আর পাইপ বের করলেন। লোকটিও তাই করল। দেখা গেল দুজনেই একই ব্রান্ডের তামাক খান। অদ্ভুত একটা কিছু ঘটছে অনুভব করে শেফিল্ড বললেন—

আমার নাম স্মিথ।

লোকটি বলল, আমারও তাই।

শেফিল্ড বললেন, পুরো নাম এরিক স্মিথ।

আমারও ওই এক, লোকটি উত্তর দিল।

এরিক মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরিক ডবলু স্মিথ ?

ঠিক তাই।

ডবলুর মানে কি ওয়েলস ? উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এরিক।

এবার হেসে ফেলল লোকটি। বলল, না। এখানেই যা দুজনের তফাৎ। আমার ডবলু হচ্ছে ওয়াল্টার-এর আদ্যক্ষর।

ছবি : সুফি

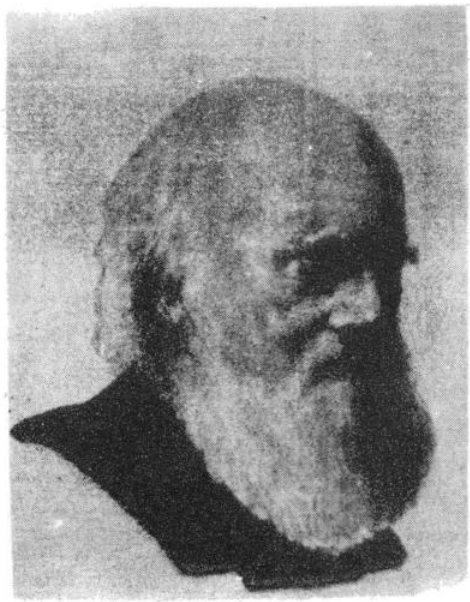

# অমর বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন

ডাঃ মনীশ প্রধান

তোমার নিজের তো কিছুই হবে না, তার ওপর বংশের নাম ডোবাবে তুমি। দিন রাত যদি কুকুর, বেড়াল, ছুঁচো, ইঁদুর নিয়ে সময় কাটাও, তোমার লেখাপড়া হবে কি করে?

তা, বাবা রবার্ট ডারউইনের তো রাগ করারই কথা। নিজে বড় ডাক্তার, ঠাকুরদাদা ডাঃ ইরাসমাস ডারউইনও ছিলেন খুব নামী দামী ডাক্তার। কয়েকটা বই লিখেছিলেন তিনি। দাদাও ডাক্তার। বাড়িতে টাকা পয়সার অভাব নেই। ছেলে চার্লস যখন যা চেয়েছে পেয়েছে। সেই পরিবারের ছেলে এই রকম পাগলামো করলে কোন বাবার মন ভালো থাকে? আট বছর বয়সে মাকে হারিয়েছে। বাবা নিজের কাজকর্ম সামলেও তাকে মায়ের মতো করে আদরে যত্নে বড় করেছেন। কোনোদিন তাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। তাও ছেলেটা যেন ছয়ছাড়া হয়ে গেল। এইরকম শিক্ষিত পরিবারের ছেলেকে যদি স্কুলের শিক্ষক মাথা মোটা বলেন, তাহলে তার বাবার মনে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক।

তবে চার্লস কিন্তু সত্যি সত্যি বোকা ছিল না। স্কুলের রুটিন মাফিক পড়া তার ভাল লাগত না। ঐ বয়সেই প্রকৃতিবিদ্যা ও এখানে ওখানে পড়ে থাকা নানা ধরনের প্রাণী-পতঙ্গ, গাছের ছাল পাতা ইত্যাদির নমুনা ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দিত। লোকে কী বললো তাতে মোটেই কান দিত না। বিজ্ঞানসাধক হতে গেলে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা। সেই তীক্ষ্ণতা ছিল চার্লসের সহজাত। 'সাধারণ জিনিস যা অনেকের চোখে ধরা পড়ে না, তা আমার চোখ এড়ায় না।' অনেক পরে যখন বিজ্ঞানী হিসেবে নাম যশ ছড়িয়ে পড়েছে তখন চার্লসের নিজের মুখেই শোনা গিয়েছিল এই কথাগুলি। দাম্ভিক মনে হলেও কথাগুলি কিন্তু খাঁটি সত্যি।

এই বিজ্ঞানীর নাম চার্লস ডারউইন। জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ইংলন্ডের শ্রুসবেরি শহরে।

ঠিক মতো লেখাপড়া না করার জন্য ডাঃ রবার্ট চার্লস-এর ওপর বিরক্ত হলেও, ছেলের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উপর তাঁর খুব আস্থা ছিল।

সাত বছর ডাঃ বার্টবলের স্কুলে পড়ে ১৮২৫ সালে চার্লস দাদা ইরাসসাসের সঙ্গে এডিনবরা এলেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু দেখা গেল লেখাপড়ায় তাঁর একেবারেই মন নেই। বেশি সময় তিনি, জীবনের শুরু কিভাবে হলো, মানুষ কিভাবে এলো, এই সব বিষয়ে আলোচনা শুনতে যেতেন। শেষে দুবছর ফেল করার পরে তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন।

তবে শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলেকে একটা ভালো মতো সম্মানজনক কাজ তো করতেই হবে। তাই ব্যবস্থা হলো চার্লস পাদরী হবার জন্য শিক্ষা নেবেন। সেই মতো ১৮২৮ সালে তিনি কেমব্রিজ গেলেন। এখানে অধ্যাপক হেনশ্লো উদ্ভিদবিদ্যা পড়াতেন। চার্লস নিয়মিত তাঁর বক্তৃতা শুনতে যেতেন। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণে বেরোতেন। সেখানেও লেখাপড়ার চেয়ে পোকামাকড় গাছ-পাতা সংগ্রহে তাঁর বেশি আগ্রহ দেখা গেল। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি পাদরী হবার ডিগ্রী পেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। তবে পাদরীর কাজ তাঁকে করতে হলো না। অধ্যাপক হেনশ্লো চিঠি লিখে তাঁকে 'এইচ-এম-এস-বিগল' জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের কাছে পাঠালেন। জাহাজটি দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে যাবে। তাই ক্যাপ্টেন ফিজরয় জাহাজে এমন একজন শিক্ষিত লোককে নিতে চাইছিলেন, যাঁর জীবজন্তু ও গাছপালার প্রকৃতি অনুশীলনে আগ্রহ আছে।

১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর 'বিগল' ইংলন্ডের ডেভেনপোর্ট বন্দর ছেড়ে যাত্রা আরম্ভ করল। ডেকে রেলিং ধরে তরুণ চার্লস তীরের দিকে চেয়েছিলেন যতক্ষণ তীর দেখা গিয়েছিল।

'বিগল'-এর উদ্দেশ্য ছিল দুবছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল জরিপ করা। এই সময়ে চার্লস সে দেশের গাছপালার প্রকৃতি, কীট-পতঙ্গের পার্থক্য অনুশীলন করবেন।

চার্লস-এর নজর ছিল খুব তীক্ষ্ণ ও গভীর। ধৈর্য সহকারে

তিনি নিয়মিত গাছের চারা, পাতা, পাথরের টুকরো, পতঙ্গ, জীব-জন্তুর হাড় ও ফসিল যোগাড় করে বাক্সে পুরে ডেকে জমা করতেন এবং পরের বন্দরে জাহাজ থামলেই দেশে পাঠিয়ে দিতেন। বহু অজানা উপকূল জরিপ করে, বহু অপরিচিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করে, নানা জাতের প্রাণী দেখে তাঁদের জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার পাঁচশ মাইল পশ্চিমে এক দ্বীপপুঞ্জের কাছে নোঙর ফেলল। সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম গ্যালাপাগোজ। এখানে জীবজন্তু, পাখি, সরীসৃপের আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন দ্বীপে ছিল বিভিন্ন রকমের। ডারউইনের মনে প্রশ্ন উদয় হলো এদের জন্ম যখন একই সঙ্গে হয়েছে তখন তাদের মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য থাকবে কেন? এই অস্বাভাবিক আদিম প্রকৃতির বিভিন্ন প্রজাতির জন্তুদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা গেল তাতে তাঁর ধারণা হলো পরিবেশের প্রভাবে জীবজন্তু গাছপালা প্রভৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক সম্পদের এই পরিবর্তন যা ডারউইনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তা তাঁকে পরবর্তীকালে বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পিসিজ' লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল।

একটি দ্বীপের উপ-প্রশাসক ডারউইনকে জানালেন ওই দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটি থেকে কচ্ছপের প্রজাতি সমস্ত দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল আবার কিছুটা সাদৃশ্যও ছিল। ডারউইনের ধারণা হলো সাদৃশ্য যাই হোক তা সম্ভব হবে যদি ঐ প্রজাতির পূর্বপুরুষেরা একই শ্রেণীর হয়। আর পার্থক্য বংশপরম্পরায় ছোট ছোট ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলে সম্ভব হয়েছে। এই ভাবে প্রাণীর বিবর্তন মতবাদ তাঁর মনকে প্রভাবিত করে। তিনি বুঝতে পারলেন, পরিবর্তন হয়। কিন্তু কেন এবং কিভাবে হয়—এই প্রশ্নের উত্তর তাঁকে জানতে হবে।

১৮৩৬ সালের ২ ডিসেম্বর পাঁচ বছর পরে ডারউইন দেশে ফিরলেন। দীর্ঘ ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন তাঁর মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

দেশে ফিরে কিছুদিন কেমব্রিজে কাটিয়ে তিনি লন্ডনে এলেন। তার আগে অধ্যাপক হেনস্লোর কাছে পাঠানো সংগৃহীত জিনিসগুলি পর্যায়ক্রমে তালিকাভুক্ত করে 'ভ্রমণকালীন ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা' এই শিরোনামে ভূতাত্ত্বিক সমিতির অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তা ছাড়া প্রাণীজগৎ ও ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। কিন্তু এইসব প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এই সময় তাঁর ব্যবহারে একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি যেন কিছুটা অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বিবর্তনবাদের একটি বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিতে না পারার জন্য বোধহয় তাঁর মন শান্ত হতে পারছিল না। ১৮৩৭ সালে ডারউইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পিসিজ' লেখা আরম্ভ করেন। শেষ হয় কুড়ি বছর পর।

ইতিমধ্যে ১৮৫৫ সালে আলফ্রেড ওয়ালেস নামে একজন বায়োলজিস্ট একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে ডারউইনের অপ্রকাশিত মতবাদের বহু তথ্য ছিল। এর পরে ডারউইনের বন্ধুরা উপদেশ দিলেন তাঁর গবেষণার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি প্রকাশ করুন। কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় কান দিলেন না।

মত বদলাতে হলো ১৮৫৮ সালে, যখন ওয়ালেস ডারউইনের কাছে একটি প্রবন্ধ পাঠালেন। প্রবন্ধটি ছিল 'আদিম অবস্থা থেকে প্রাণী ও প্রকৃতির সরে আসার প্রচেষ্টা'। ডারউইন দেখলেন এ লেখা যেন তাঁর মতবাদের সংক্ষিপ্তসার। এবার তিনি ঠিক করলেন তাঁর গবেষণার বিষয় তিনি বিশ্বে প্রকাশ করবেন। সেইমতো ১৮৫৮ সালের ১ জুলাই লন্ডনের লিনেনিয়ান সোসাইটিতে ওয়ালেসের রচনা ও ডারউইনের গবেষণার সারাংশ প্রকাশ করা হয়।

পরের বছর 'দি অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি জানালেন ভূতত্ত্ব ও ভৌগোলিক প্রকৃতির জন্য উদ্ভিদ ও জন্তুর ওপর প্রভাব পড়ে। সমস্ত পুস্তকটি বিবর্তনবাদের প্রামাণিক তথ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ডারউইনকে দারুণ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তবে সমালোচনা হলেও বইটি সাধারণের মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিল। দুটি সংস্করণে ছাপা হয়েছিল মোট ছাব্বিশ হাজার। কয়েক বছরের মধ্যেই সভ্যজগতের প্রায় সকল ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৬০ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞান সভায় ডারউইনকে আক্রমণ করে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। অক্সফোর্ডের বিশপ ভীষণভাবে ডারউইনকে বিদ্রূপ করে বক্তব্য রাখেন।

তবে যাঁকে নিয়ে এই বিতর্ক তিনি ছিলেন খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। সেই কারণেই তিনি নিজেকে বিতর্কে জড়াতে চাইতেন না। দেশে ফিরে তিরিশ বছর বয়সে তিনি এজমা ওয়েজউডকে বিবাহ করে পরিবারের সঙ্গে কেন্টে বাস করতে থাকেন। অর্থের অভাব ছিল না। অসুস্থতার জন্য বেশি দূরে কোথাও যেতেন না। নিজের বাগানে বেড়াতেন, গাছের সেবা করতেন, আর তার মধ্যেই করতেন উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা।

১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল প্রায় ৭৩ বছর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। মৃত্যুর পরে তাঁকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে নিউটন ও তাঁর বন্ধু বিজ্ঞানী লালের পাশে সমাহিত করা হয়।

চার্লস ডারউইনের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরেও 'অরিজিন অব স্পিসিজ' নিয়ে বিতর্ক বন্ধ হয়নি। ১৯২৫ সালে আমেরিকার টেনেসি রাজ্যে জন স্কোপস্ নামে এক শিক্ষককে ডারউইনের মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। পরে অবশ্য রায় বাতিল হয়ে শাস্তি মকুব করা হয়।

চার্লস ডারউইন বিশ্বাস করতেন বৈজ্ঞানিক মতবাদের পরিবর্তন হয়। হয়তো তাঁর মতবাদও একদিন বদল হবে। তবে তার কাঠামো ঠিকই থাকবে।

# এখন শুধু খেলা আর খেলা—বিশ্বকাপের খেলা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

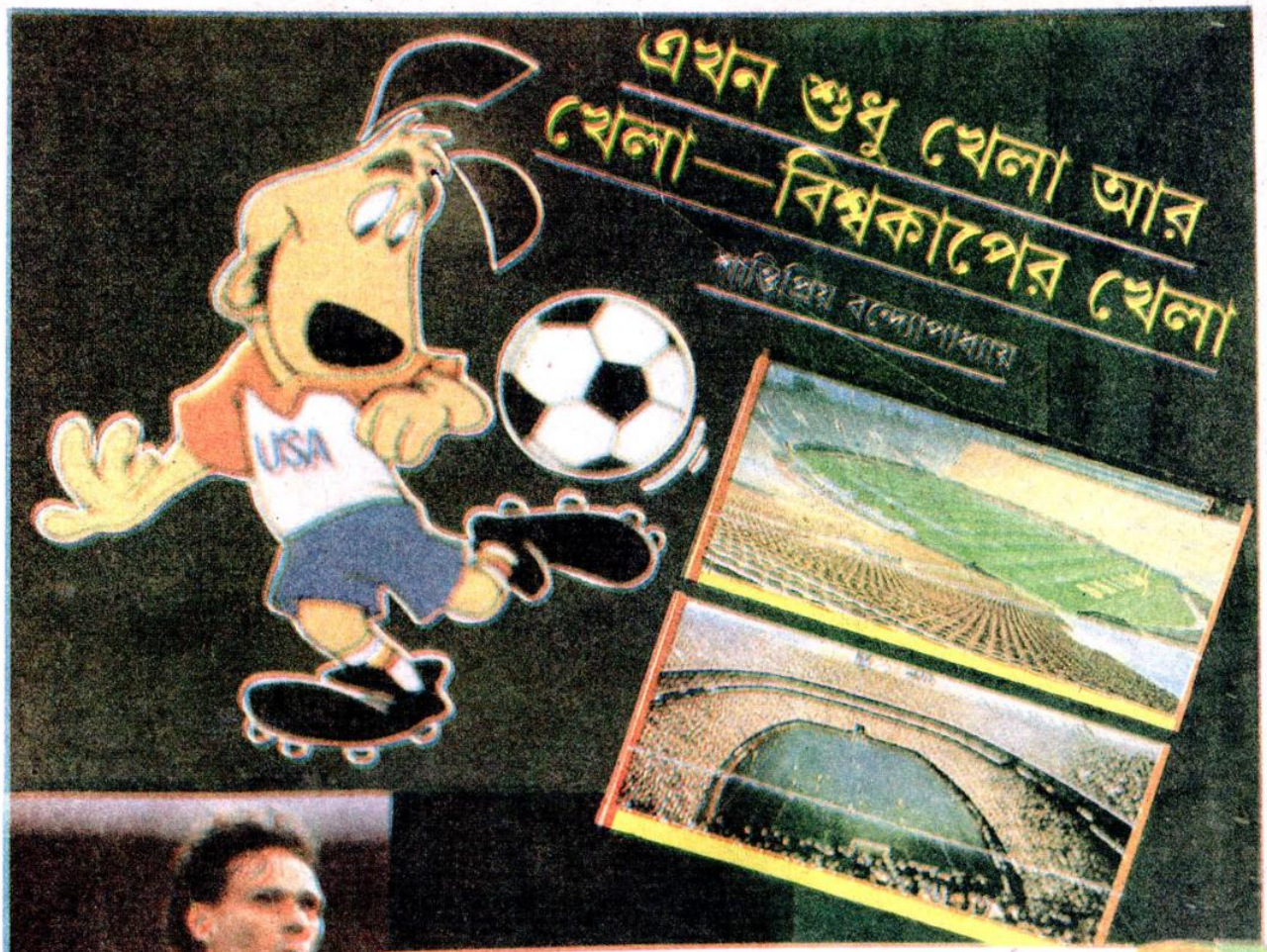

বিশ্বকাপের খেলা এখন শেষ পর্বে। এবারের প্রতিযোগিতায় কোন দেশ কি অঘটন ঘটালো তা তো তোমরা জানোই। এখন চলছে আসল খেলাগুলো। কারা খেলছে তা এই জুন মাসের গোড়ায় বসে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কারণ বিশ্বকাপে ইন্দ্রপতন তো নতুন কিছু নয়। তবু মনে হয় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড কিংবা অন্য কোনো দেশ ফিফা বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে লড়ছে। ভাগ্যলক্ষ্মী যে কার গলায় বিজয়মুকুট পরাবে কে জানে। ফুটবল নিয়ে সারা বিশ্ব এখন এমন মেতে আছে যে লন্ডনে যে উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা হচ্ছে, বিশ্বের সেরা পুরুষ ও মহিলা টেনিস তারকারা কোর্টে কোর্টে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সে খেয়ালটুকুও কারো নেই। প্রত্যেকবারই অবশ্য এই রকম হয়। বিশ্বকাপের দাপটে ধাম্মাচাপা পড়ে যায় উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা। সাম্প্রাস, কুরিয়ার, স্টেফি, পিয়ার্স, সাবাতিনি, স্যানচেজদের অবশ্য তাই বলে কেউ ভুলে যায় না। এই যে বলের চামড়া তোলা নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে তার খবরও কি আমরা রাখছি না? ইমরান বলেছেন, সব ফাস্ট বোলাররাই বলের চামড়া তুলে বেশি করে সুইং করানোর চেষ্টা করে। এ তো একেবারে বোমা ফাটানো। প্রথমে

কপিলদেব ভীষণ ভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন ইমরানের ঐ মন্তব্যের। তিনি বলেছেন, জীবনে ঐরকম জঘন্য অন্যায় কাজ তিনি করেননি। করলে বিশ্বরেকর্ড গড়ার জন্যে তাঁকে এতোদিন বসে থাকতে হতো না। বথামও ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, ইমরান নিজের মতো সবাইকে ভাবছেন। আসলে বলের চামড়া তুলে ফায়দা লোটার ব্যাপারটার উদ্ভাবক ইমরানই। উইলিসও এক হাত নিয়েছেন ইমরানকে। আর ফ্রেড ট্রুম্যান বলেছেন, আমিই তো টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম তিনশ উইকেট দখল করি। আমাকে তো কোনো দিন ঐ সব আপত্তিজনক কাজ করতে হয়নি। ইমরানের মতো বলের চামড়া তুলে বল করলে আমার সংগ্রহ ঢের ঢের বেড়ে যেতো। ব্যাপারটা নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড় হচ্ছে। আসলে ইমরান তাঁর নতুন বইতে বলের চামড়া তোলার ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে লিখেছেন। কোন খেলায় বোতলের ছিপি ঘষে বলের চামড়া তুলেছেন তাও তিনি লিখেছেন। পুরো ব্যাপারটা ক্রিকেট বিশ্বে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এর পর সকলেই পাকিস্তানের ফাস্ট বোলারদের সন্দেহের চোখে দেখবেন। কারণ এই সব 'আনফেয়ার' ব্যাপার-স্যাপারের দিকে পাকিস্তানীদের ঝোঁকটাই সব থেকে বেশি।

কিন্তু এতো সব হৈচৈ—সবই চাপা পড়ে গেছে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার চাপে। প্রতিযোগিতার হপ্তা দুয়েক আগে গুলিতের পর বাস্তেনও (বাস্তেনকে দলে ডাকা হয়েছিলো গুলিতের শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্যে) সরে গিয়েছিলেন হল্যান্ড দল থেকে। গুলিতের অনুপস্থিতিতে হল্যান্ডের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। গুলিত কেন দল থেকে সরে গেলেন সে কথা তিনি কিন্তু বলেননি। বলেছেন পরে জানাবেন। তবে মনে হয় কোচের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতেই গুলিত জাতীয় দল.

বাজ্জিও

লোথার ম্যাথাউজ

মারাদোনা

গুলিত

থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। আর বাস্তেনের বিষয়ে বলা হচ্ছে, ওঁর ক্লাব এ সি মিলানের চাপেই নাকি বাস্তেনকে জাতীয় দল থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ও সব অবশ্য পুরনো কথা।

এবার আসি সেই সব খেলোয়াড়দের কথায় যাঁদের অনেকেই নজর কেড়েছেন। **আমেরিকার জন হারকিস** (জন্ম ৮ মার্চ ১৯৬৭), **জার্মানির লোথার ম্যাথাউজ** (জন্ম ২১ মার্চ ১৯৬১, পশ্চিম জার্মানির পক্ষে খেলছেন ১৯৮০ সাল থেকে। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়), **কলম্বিয়ার কারলোস ভালদারামা** (জন্ম ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, ১৯৮৫ সাল থেকে জাতীয় দলে খেলছেন), **ব্রাজিলের রোমারিও** (জন্ম ২৯ জানুয়ারি ১৯৬৬, ১৯৮৮ সাল থেকে জাতীয় দলের পক্ষে খেলছেন, স্পেনের বার্সিলোনার নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়), **স্পেনের অ্যানডোনি জুবিজারেতা** (জন্ম ২৩ অক্টোবর ১৯৬১, দক্ষ এই গোলরক্ষকটি স্পেনের পক্ষে খেলছেন ১৯৮৫ সাল থেকে), **কলম্বিয়ার ফাউস্টিনো আসপ্রিলা** (জন্ম ৬ নভেম্বর ১৯৬৯, ১৯৯২ সাল থেকে কলম্বিয়ার পক্ষে খেলছেন), **সুইজারল্যান্ডের স্টিফেন চাপির্ডসাট** (জন্ম ২৮ জুন ১৯৬৯, দেশের পক্ষে খেলছেন ১৯৮৯ সাল থেকে), **সুইডেনের মার্টিন ডালিন** (জন্ম ১৬ এপ্রিল ১৯৬৮, ১৯৮৮ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছেন), **বলিভিয়ার**

দোনাদোনি

**আরউইন স্যানসেজ** (জন্ম ১৯ অক্টোবর ১৯৬৯, ১৯৮৯ সাল থেকে জাতীয় দলে খেলছেন), **ক্যামেরুনের ফ্রাঙ্কোইস ওমাম বিইক** (জন্ম ২১ মে ১৯৬৬, ১৯৮৫ সাল থেকে জাতীয় দলের খেলোয়াড়), **ব্রাজিলের বাই ডে সুজা ওলিভিয়েরা** (জন্ম ১৫ মে ১৯৬৫, ১৯৯২-৯৩ সালে ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম খেলেন), **রোমানিয়ার জর্জি হাজি** (জন্ম ১৯৬৪, ১৯৮৩ সালে জাতীয় দলে প্রথম খেলেন)।

এবারের বিশ্বকাপে ওঁদের জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও মারাদোনা, বাজ্জিও, ক্যানিগিয়া, বেবেতো, দোনাদুনির মতো খেলোয়াড়রাই হয়তো বিশ্বফুটবলের আসর মাত করে দেবেন। অবশ্য ওঁদের তালিকায় আরও বেশ কয়েকজনের নাম জুড়তে হবে। আসলে, ঐ যে কথায় বলে না পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। ব্যাপারটা অনেকটা তাই।

মোট কথা জুলাই মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর চোখ থাকবে আমেরিকার দিকে। আর আমরা রাত জাগবো টিভির দিকে তাকিয়ে। সেই জুন মাসের ১৭ তারিখ থেকে ঘুম-টুমের বালাই তো আর নেই। এখন শুধু খেলা আর খেলা—বিশ্বকাপের খেলা।

জন বার্নস

# যেখানে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হবে

## রোস বাওয়েল স্টেডিয়াম

লস অ্যাঞ্জেলেসের রোস বাওয়েল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হবে। স্টেডিয়ামটি তৈরি হয় ১৯২২ সালে। ১,০২,০৮৩ জন দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা আছে এই স্টেডিয়ামে।

**এই স্টেডিয়ামে একটি সেমিফাইনাল খেলা হবে ১৩ জুলাই। ভারতীয় সময় রাত ৩-৩০ মিনিট থেকে খেলাটি দূরদর্শনে সরাসরি দেখা যাবে।**

**ফাইনাল খেলাটি হবে ১৭ জুলাই। রাত ১টা থেকে খেলাটি দূরদর্শনে সরাসরি দেখা যাবে।**

## জায়েন্টস স্টেডিয়াম

নিউ ইয়র্কের এই স্টেডিয়ামে ১৩ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি হবে। দূরদর্শনে খেলাটি সরাসরি দেখা যাবে রাত ১-৩০ মিনিট থেকে।

স্টেডিয়ামটি নিউইয়র্ক থেকে ৫ মাইল দূরে। নিউইয়র্ক কসমসের স্টেডিয়াম। তৈরি হয় ১৯৭৬ সালে। মোট ৭৬,৮৯১ জন দর্শক এখানে বসে খেলা দেখতে পারেন।

# এক নজরে বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের

## ফলাফল

| সাল | স্থান | ফলাফল | সেবারের সর্বোচ্চ গোলদাতা |
|---|---|---|---|
| ১৯৩০ | উরুগুয়ে | উরুগুয়ে (৪) ঃ আর্জেন্টিনা (২) | গিলারমো স্টেবাইল (আর্জেন্টিনা)-৮টি |
| ১৯৩৪ | ইতালি | ইতালি (২) ঃ চেকোস্লোভাকিয়া (১) | স্টিভিও (ইতালি)<br>নেজেডলি (চেক)<br>কনেন (জার্মানি) } ৪টি করে |
| ১৯৩৮ | ফ্রান্স | ইতালি (৪) ঃ হাঙ্গেরি (২) | লিওনিডাস ডাসিলভা (পর্তুগাল)-৮টি |
| ১৯৫০ | ব্রাজিল | উরুগুয়ে (২) ঃ ব্রাজিল (১) | আদেমির-৭টি |
| ১৯৫৪ | সুইজারল্যান্ড | পঃ জার্মানি (৩) ঃ হাঙ্গেরি (২) | ককসিস (হাঙ্গেরি)-১০টি |
| ১৯৫৮ | সুইডেন | ব্রাজিল (৫) ঃ সুইডেন (২) | ফনটেনি (ফ্রান্স)-১৩টি |
| ১৯৬২ | চিলি | ব্রাজিল (৩) ঃ চেকোস্লোভাকিয়া (১) | জারচোভিচ (যুগোস্লোভিয়া)-৫টি |
| ১৯৬৬ | ইংলন্ড | ইংলন্ড (৪) ঃ পঃ জার্মানি (২) | ইউসোবিও (পর্তুগাল)-৯টি |
| ১৯৭০ | মেক্সিকো | ব্রাজিল (৪) ঃ ইতালি (১) | গার্ডমুলার (পঃ জার্মানি)-১০টি |
| ১৯৭৪ | পঃ জার্মানি | পঃ জার্মানি (২) ঃ হল্যান্ড (১) | লাটো (পোলান্ড)-৭টি |
| ১৯৭৮ | আর্জেন্টিনা | আর্জেন্টিনা (৩) ঃ হল্যান্ড (১) | কেম্পেস (আর্জেন্টিনা)-৬টি |
| ১৯৮২ | স্পেন | ইতালি (৩) ঃ পঃ জার্মানি (১) | পাওলো রোসি (ইতালি)-৬টি |
| ১৯৮৬ | মেক্সিকো | আর্জেন্টিনা (৩) ঃ পঃ জার্মানি (২) | গ্যারি লিনেকার (ইং)-৬টি |
| ১৯৯০ | ইতালি | পঃ জার্মানি (১) ঃ আর্জেন্টিনা (০) | সিলাচি (ইতালি)-৬টি |
| ১৯৯৪ | আমেরিকা | | |

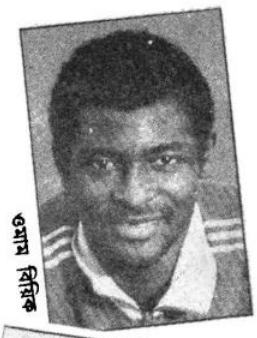

ওমাম বিয়িক

রোমারিও

ভালদারামা

# স্পোর্টস কুইজ

**প্রশ্ন ঃ**

এ বারের সব প্রশ্ন বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে (১৯৯০ পর্যন্ত)।

১। বিশ্বকাপের ফাইনালে সবচেয়ে বেশি বার খেলেছে কোন দেশ? সেই খেলার ফলাফল কি?

২। বিশ্বকাপের ফাইনালে এ পর্যন্ত একজন খেলোয়াড়ই হ্যাটট্রিক করতে পেরেছেন। তাঁর নাম কি? কোন দেশের? কার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন? কোন সালে?

৩। বিশ্বকাপে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি গোল করেছে? কতো? কোন সালে? কোথায়?

৪। কোন ম্যানেজার পরপর দুবার তাঁর দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন? কোন কোন সালে?

৫। বেকেনবাউয়ার খেলোয়াড় ও ম্যানেজার হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছেন। এই কৃতিত্ব কি আর কেউ অর্জন করেছেন?

৬। কোন খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিন তিনটি দেশের হয়ে খেললেও কোনওদিন বিশ্বকাপে খেলেননি?

৭। বিশ্বকাপে সব থেকে বেশি দর্শক সমাগমের রেকর্ড কি? কত দর্শক মাঠে এসেছিলেন? কার কার খেলা দেখতে?

৮। পরপর দুবার বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছেন এবং গোল করেছেন এমন কি কেউ আছেন?

৯। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড কে গড়েছিলেন?

১০। বিশ্বকাপে দ্রুততম গোলটি কে করেছেন? খেলা আরম্ভর কতক্ষণের মধ্যে? কোন খেলায়? কত সালে?

১১। বিশ্বকাপের মূল পর্বে একটি খেলায় সব থেকে বেশি গোলের রেকর্ড কি?

১২। ১৯৮২ সালে ইতালির পাওলো রোসি মোট কতগুলি গোল করেছিলেন?

সুইডেনের স্ট্রাইকার টমাস ব্রোলিন

**উত্তর ঃ**

১। পশ্চিম জার্মানি। মোট ৬ বার ফাইনালে খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৯৫৪, ১৯৭৪ ও ১৯৯০ সালে। রানার্স আপ—১৯৬৬, ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সালে।

২। ইংলন্ডের জিওফ হার্স্ট। পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে। ১৯৬৬ সালে।

৩। হাঙ্গেরি। ২৭টি গোল। ১৯৫৪ সালে সুইজারল্যান্ডে।

৪। ভিক্টর পোজো। ইতালিকে তিনি ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছিলেন।

৫। হ্যাঁ। ব্রাজিলের মারিও জাগালো এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ১৯৫৮ সালে এবং ম্যানেজার হিসেবে ১৯৭০ সালে তিনি বিশ্বকাপ জিতেছেন।

৬। আলফ্রেডো ডিস্টিফানো। তিনি আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও স্পেনের পক্ষে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেললেও কোনওদিন বিশ্বকাপে খেলেননি।

৭। ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্রাজিলের সঙ্গে উরুগুয়ের খেলা দেখতে ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন ১,৯৯,৮৫৪ জন দর্শক।

৮। হ্যাঁ, আছেন। ব্রাজিলের ভিভা ১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে সুইডেনের বিরুদ্ধে ২টি গোল দিয়েছিলেন। চার বছর পরে ১৯৬২ সালের ফাইনালেও তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে একটি গোল করেছিলেন।

৯। ইতালির সালভাতোর সিলাচি। সিলাচি মোট ৬টি গোল দিয়েছিলেন।

১০। ইংলন্ডের ব্রায়ান রবসন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ২৭ সেকেন্ডের মধ্যে, ১৯৮২ সালে।

১১। মোট ১২টি গোল। অস্ট্রিয়া (৭)ঃ সুইজারল্যান্ড (৫)। ১৯৫৪ সালে।

১২। ৬টি।



বেবেতো

# উক্তি

কেন হল্যান্ড দল থেকে সরে গেলাম সে কথা এখন নয় পরে বলবো।

রুদ গুলিত

(ম্যানেজারের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার পর ক্যাম্প ছেড়ে চলে গিয়ে)

গুলিত নেই, এই মুহূর্তে আমাদের দরকার বাস্তেনের মতো খেলোয়াড়কে। গুলিতের স্থান একমাত্র ওই নিতে পারে।

কোম্যান

(মার্কো ভ্যান বাস্তেনকে দলে ডাকার পর দলনেতার উক্তি)

কোচ যা বলবেন তাই শুনতে রাজী। শেষবার বিশ্বকাপে খেলবো। আপ্রাণ চেষ্টা করবো নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে।

দিয়েগো মারাদোনা

(প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সময় এক সাক্ষাৎকারে)

জার্মান দলে এবার বুড়োদের ভিড়। ওরা তো কেউ মারাদোনা নয়—তাই অতো ভয় পাবার কিছু নেই।

পাওলো রোসি

(সম্প্রতি একটি লেখায়)

আর্জেন্টিনা দলে মারাদোনা না থাকলে ওদের নিয়ে ভাবার দরকারই ছিল না। আসলে মারাদোনা একাই যে একটি দলের ভাগ্য গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

লোথার ম্যাথাউজ

(একটি সাক্ষাৎকারে)

এবার কোনো দেশকেই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। যে কোনো দেশই এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। যে কোনো দেশ বলতে আমি জার্মানি, আর্জেন্টিনা, ইতালি, ব্রাজিল, হল্যান্ডের কথাই বলছি।

ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার

(সম্প্রতি একটি লেখায়)

এবারের বিশ্বকাপের মূল পর্বে ইংলন্ড নেই। ভাবতেই অবাক লাগছে। লিনেকার পর পর তিনটে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হারালো।

শিলটন

(সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে)

ফুটবল মহান খেলা। সারা বিশ্বকে এক সুতোয় বেঁধে দিতে পারে এই একমাত্র খেলাই। ফুটবলের সেই মহান যজ্ঞে আমারও সামান্য অবদান আছে বুঝে আমি রীতিমতো গর্বিত হই।

পেলে

(সম্প্রতি একটি লেখায়)

কিছু ছবি স্প্যানিশ পত্রিকার সৌজন্যে।

# হল্যান্ডের স্ট্রাইকার বাস্তেন

সুমন ভট্টাচার্য

ছেলেটির বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর। অ্যাজাক্স আমস্টার্ডামের একটা খেলা চলছে। বিরতির সময় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন কিংবদন্তী ডাচ ফুটবলার জোহান ক্রুয়ফ। তিনি কোচকে বললেন তাঁর বদলে ওই ছেলেটিকে নামাতে। সেই শুরু, তারপর আর পিছন ঘুরে তাকাননি মার্কো ভন বাস্তেন। ক্রুয়ফের দেওয়া মশাল নিয়ে তাঁরই পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন বাস্তেন।

১৯৮৩ থেকে ৮৭-র মধ্যে প্রতি মরশুমে গোল করেছেন গড়ে ২৯.৫টা করে। ১৯৮৭-তে ৩১টা গোল করে ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে পেয়েছেন গোল্ডেন বুট পুরস্কার। ছিলেন উটট্রেমট শহরের সামান্য অ্যাথলিট, সেখান থেকে ক্রুয়ফের ছোঁয়ায় তিনি হয়ে যান হল্যান্ডের তারকা। মাত্র ২৩ বছর বয়সে অ্যাজাক্সের হয়ে জিতে নেন তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ। চারবার হল্যান্ড কাপ। সবচেয়ে বড় কথা, ক্রুয়ফের কোচিংয়েই পেয়েছেন ১৯৮৭তে কাপ উইনার্স কাপ।

১৯৮৭তে বাস্তেন চলে গেলেন ইটালীর এ. সি. মিলানে। সেখানেও বইয়ে দিলেন গোলের বন্যা। ১৯৮৮-৮৯তে ইতালীয় মরশুমে করলেন ১৯টি গোল। আরো ১০টি গোল করে মিলানকে এনে দিলেন ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন্স কাপ। এ বছরেও তাঁকে বাছা হয়েছে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার, আবার বিশ্ববিখ্যাত 'ওয়ার্ল্ড সকার' পত্রিকা তাঁকে দিয়েছে বিশ্বসেরা ফুটবলারের সম্মান। ১৯৮৯তেও বাস্তেন পেয়েছেন ইউরোপের সেরা ফুটবলারের সম্মান। ১৯৯০তে ইটালীয় লীগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ১৯টি গোল করে।

শুধুমাত্র এ. সি. মিলানকেই অসংখ্য ট্রফি এনে দেননি তিনি, হল্যান্ডকেও ১৯৮৮তে করেছেন ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন। আর তা সম্ভব হয়েছে সেমিফাইনালে চিরশত্রু পশ্চিম জার্মানি এবং ফাইনালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়ে। দুটি খেলাতেই একটি করে গোল করেছেন বাস্তেন। সেমিফাইনালে জার্মান গোলরক্ষককে ধোঁকা দিয়ে বল ঢুকিয়ে দেন জালের মধ্যে। আর ফাইনালে অসাধারণ দক্ষতায় শূন্য ডিগ্রী থেকে মুস্তারের ক্রসে একলহমায় ভলি করে রুশ গোলরক্ষক রিনাতদাসায়েভকে পরাস্ত করেন। আসলে বাস্তেন মানেই যেন অসম্ভব সব গোল। যেমন ১৯৯০তে চ্যাম্পিয়ন কাপ সেমিফাইনালে রিয়েল মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলার সময় দুজন ডিফেন্ডারের পায়ের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসামান্য একটি গোল করেছিলেন।

১৯৯০-এর বিশ্বকাপে অবশ্য চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন বাস্তেন। সেইজন্য ইটালীর কাগজ তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল। 'নিরুদ্দেশ সংবাদে' কার্টুন ছেপেছিল তাঁর ছবি দিয়ে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা থেকে আবার ফিরে এসেছিলেন বাস্তেন। ৯২-এর মরশুমে মিলানের হয়ে ৯টা খেলায় ১২টা গোল করেছিলেন। এর মধ্যে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন কাপে মিলান যখন আই.এফ-কে গমেনবার্গকে হারায় ৪-০ গোলে, তখন বাস্তেন একাই করেছিলেন সবকটি গোল। ঐ বছর 'ওয়ার্ল্ড সকার' পত্রিকা আবার তাঁকে বিশ্বের সেরা ফুটবলার হিসাবে বাছে।

সম্প্রতি বাস্তেন পায়ে আঘাত পাওয়ায় সবাই চিন্তিত। কারণ অন্য তিন ডাচ স্ট্রাইকার ডেনিস বার্গক্যাম্প, জনি বসক্যাম্প কিংবা রোনাল্ড ডি বর কেউই তাঁর মতো দামী নন। বাস্তেন সবসময়ই ভয়ঙ্কর। গোলের সামনে শিকারী চিতা। ব্রিটিশ ফুটবল বিশেষজ্ঞ ববি চার্লটন তো পেনাল্টি বক্সে বাস্তেনের চলাফেরার সঙ্গে তুলনা করেছেন ব্যালে নৃত্যশিল্পীর।

# পড়ার সঙ্গে খেলা

## শেওড়াফুলি সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতন

**বীরু বসু**

আজকাল অনেক স্কুলেই দেখা যাচ্ছে লেখাপড়ার সঙ্গে তাল রেখে খেলাধূলাতেও সমান সাফল্য পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। কারণ সব স্কুলেই এখন খেলাধূলার ওপর আলাদা নজর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একাধারে খেলোয়াড় ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রী গড়ার কাজটা বেশ কঠিন। তবে ধৈর্য ও চেষ্টা থাকলে যে কোনো কঠিন কাজে সাফল্য পাওয়া সম্ভব। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হুগলী জেলার শেওড়াফুলি সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র হেমন্ত ডোরা।

খুব অল্পের জন্য হেমন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে না গিয়ে ২য় বিভাগে পাশ করে। খেলাধূলাতেও সে বেশ নাম করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেই ৮৮-তে সারা ভারত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করে। তার পরে জামসেদপুরে আয়োজিত রাজীব গান্ধী গোল্ড কাপসহ বেশ কিছু বড়সড় ম্যাচে জাতীয় সিনিয়র দলের হয়ে খেলে। মাদ্রাজে নেহরু কাপ টুর্নামেন্টে বিদেশী দলের পেনাল্টি আটকে দিয়ে হেমন্ত যা চমক দেখিয়েছে তাতে কলিকাতার দলবদলে সর্বোচ্চ দর হাঁকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

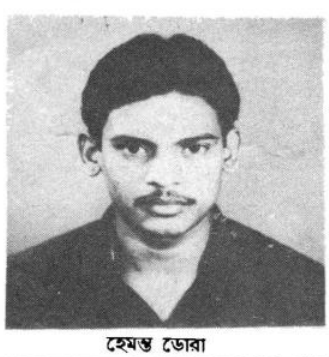

হেমন্ত ডোরা

বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা—তিনটি শাখায় সাফল্য পাওয়া হেমন্তর স্কুলটির বয়স ত্রিশ বছর। গোড়ার দিকে ছাদে লাগানো ছিল অ্যাসবেসটসের ছাউনি। এখন স্কুলে তৈরি হয়েছে সিমেন্টের পূর্ণাঙ্গ দালান। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বারশোতে। পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষককে নিয়ে যিনি উনত্রিশ বছর ধরে স্কুলটির প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য পালন করে আসছেন তিনি হলেন শ্রীউমাপদ সিংহ। গত বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি অবসর নিয়েছেন।

রানার্স কাপ বিজয়ী ফুটবল দল।

নতুন প্রধান শিক্ষক স্বপনকুমার সাহা দায়িত্ব গ্রহণ করেই জানিয়েছিলেন স্কুল পরিদর্শন করে তিনি অভিভূত। সহ-প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র ভড় জানালেন 'কলা' বিভাগে নাকি এ স্কুলটি সারা বাংলার গর্ব। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগেও কৃতী ছাত্রের নজির মেলে। সপ্তম শ্রেণীর ক বিভাগের ছাত্র শুভাশিস বসু, অষ্টম শ্রেণীর অমিত চৌধুরী, নবম শ্রেণীর হিল্লোল ঘোষ এবং মাধ্যমিক টেস্টে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত দশম শ্রেণীর দুই কৃতী ছাত্র পার্থসারথি পাল ও প্রদীপ কুণ্ডু পড়াশুনায় এক একটি রত্ন।

একই সঙ্গে উঠে আসছে বেশ কিছু প্রতিভাধর খেলোয়াড়। এদের মধ্যে আছে অমিত সামন্ত, তাপস দত্ত, অশীমেষ পাল, প্রশান্ত ডোরা, দীপেন কোলে, টোটন ঘোষ, সুবিমল সিন্‌হা, প্রদীপ মান্না, সুমন ঘোষ ও প্রলয় সাহা। এরা সকলে ফুটবল, বাস্কেট বল ও ক্রিকেটের প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়। সকলেই মিলেমিশে স্কুলটির ওই তিনটি খেলায় সাফল্য এনেছে। গত বছরে আন্তঃস্কুল বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় এই স্কুলটি জেলার সেরা বিবেচিত হয়। এবছর তারা আন্তঃরাজ্য বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। গত বছরে জেলার সিঙ্গুর ক্লাব পরিচালিত অবনী বর্মণ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্কুলটি রানার্স হবার গৌরব অর্জন করে। ফুটবল ও বাস্কেট বলের মতো থামস্ আপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতাতেও স্কুলটির সুনাম রয়েছে। ক্রীড়াশিক্ষক রঞ্জিত ধঁক ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, স্কুল বাস্কেট বল চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও পুরস্কারের দশ হাজার টাকা জেলা ক্রীড়াসংস্থার কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত পায়নি। তাঁর মতে, জেলার ক্রীড়াসংস্থার অনুদানের ওপর নির্ভর করে স্কুল ছাত্র গড়ে না। বিদ্যানিকেতনের নিজস্ব খেলার মাঠেই প্রতিদিন টিফিনের সময়ে ছাত্ররা ঘাম ঝরিয়ে অনুশীলন করে যে যার প্রতিভা গড়ে তুলছে। তিনি আশা রাখেন ছাত্রদের সহযোগিতায় আগামী দিনেও তিনি বাস্কেট বল ট্রফিটি স্কুলে নিয়ে আসবেন।

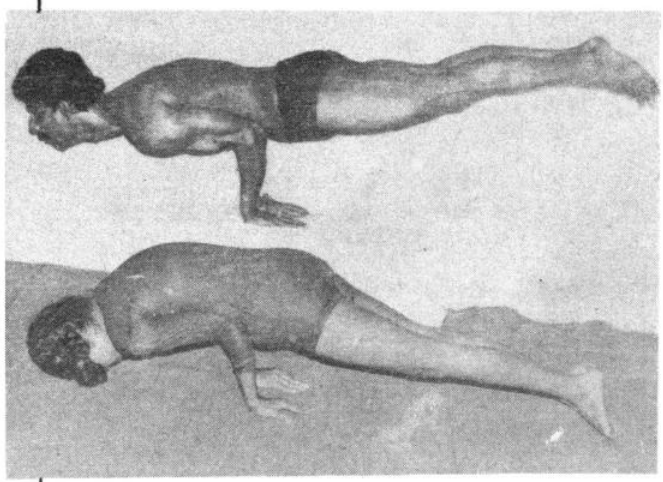

ময়ূরাসন

# শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

আগের সংখ্যা থেকে তোমাদের যে আসনগুলি শেখাচ্ছি সেগুলি তোমরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় করতে পারো। তবে মনে রেখো প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে খুব বেশি টেনশানে ভুগবে না। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার না পেলেও নিয়মিত আসন করলে, আমি জানি, সকলের জন্যই কিছু পুরস্কার বাঁধা। সেগুলি কি জানো? শারীরিক সুস্থতা, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, মনের চঞ্চলতা দূর হওয়া আর নিজের ওপর আস্থা বাড়া। তবে অনেককেই বলতে শুনি যোগাসন করার মূল লক্ষ্য যখন শরীরকে সুস্থ রাখা ও মনকে উত্তেজনামুক্ত করা তখন এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করার দরকার কি? তাঁদের বলব এর অন্যতম কারণ, মানুষকে যোগাসন ও শরীরচর্চায় আরও বেশি করে আকৃষ্ট করা।

### ময়ূরাসন

আজ দুটি আসন নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথমে ময়ূরাসন। ছবিতে ছেলেটির ভঙ্গিমাটি হলো ময়ূরাসনের। মেয়েটির ভঙ্গিমাটি ময়ূরাসন করার পূর্বরূপ। অনেকে এটিকে হংসাসনও বলেন। অর্থাৎ হংসাসন অবস্থায় হাতের কনুই দুটি নাভির দুপাশে থাকবে এবং কপাল ও পায়ের আঙুলগুলি মাটিতে লেগে থাকবে। প্রথমে নীল ডাউন হয়ে মাটিতে বসো। হাতের তালু দুটি মাটিতে পাতো, আঙুলগুলি তোমার দিকে মুখ করে রেখে। এখন ধীরে ধীরে কনুই ভাঁজ করে কনুইদ্বয় নাভির দুপাশে রাখো এবং চলে এসো মেয়েটির অবস্থানে। এইবার ধীরে ধীরে পা দুটি মাটি থেকে তুলে দাও। পরে কপালও তুলে দিও। আসন অবস্থানে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ১৫-২০ সেকেন্ড থাকতে হবে। পরে ওই একই সময়কাল চিৎ বা উপুড় হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। এইভাবে ২-৩ বার অভ্যাস করা উচিত। নিয়মিত অভ্যাসে নিশ্চয় পারবে।

অম্বল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, কোমরের অল্পবিস্তর ব্যথা এই ময়ূরাসনে ভাল হয়ে যাবার সুযোগ থাকে। অনেকে বলেন, নিয়মিত ময়ূরাসন করলে আমাদের হজমশক্তি প্রচণ্ডরূপে বেড়ে যায় তখন মানুষ যে কোনো খাদ্য খেয়ে হজম করতে পারে। অতদূর না হলেও এটুকু বলতে পারি নিয়মিত অভ্যাসে হজমশক্তি খুব বেড়ে যায়। তবে যাদের পেটে ঘা বা আলসার রয়েছে অথবা পেটে কোনো অস্ত্রোপচার হয়েছে তারা কিছুদিন এই আসনটি করতে যাবে না।

### ক্যাট ব্যাক বা মার্জারাসন

ছোট বয়সে নিশ্চয় তোমরা ঘোড়াখেলা খেলেছ। দাদুকে ঘোড়া বানিয়ে পিঠের উপর সওয়ার হয়ে তাঁকে ঘরময় ঘুরতে বাধ্য করেছ। এই ভঙ্গিমাটিকেই বলে মার্জারাসন। প্রথমে সামনের

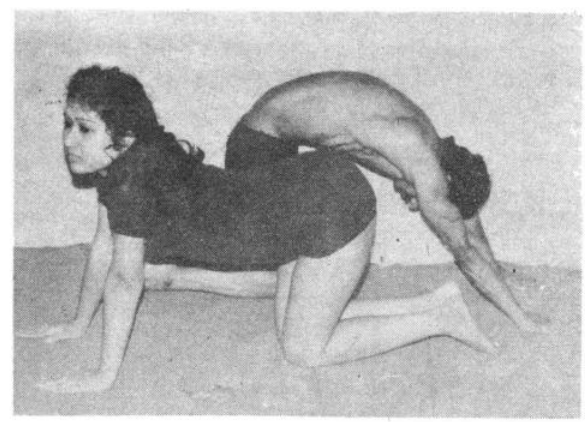

মার্জারাসন

মেয়েটির মতো দুহাত মাটিতে পেতে হাঁটু থেকে পা ভাঁজ করে, হাঁটু ও পায়ের আঙুলগুলি মাটিতে পেতে বসো। শিরদাঁড়া যতটা পারো ভিতরে ঢুকিয়ে দিও এবং মাথাটা তুলে দিও মেয়েটির মতন। এখন ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পিঠটা উঁচুতে তুলে দাও এবং তার সঙ্গে মাথা নামাও পিছনের ছেলেটির মতো। পুনরায় শ্বাস নিতে নিতে মেয়েটির অবস্থানে চলে এসো। এইভাবে ১০-১৫ বা তোমার সাধ্যমত বার কর। ১০-১৫ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে একইভাবে ২-৩ ক্ষেপে অভ্যাস করবে।

কোমরের ব্যথা, অম্বল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। আর পেটের মেদ কমাতে এই ব্যায়ামটি খুব প্রয়োজনীয়।

# ইতিহাস-উপেক্ষিত পৃথু

## স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বাংলাতেই তাঁর জন্ম। রাজা হিসেবে তিনি ছিলেন যেমন বীর তেমনিই রণকৌশলী। রাজা পৃথু বাংলার প্রথম বিদেশী আক্রমণকারী তুর্কীদের শুধু পরাজিতই করেননি, সেই সঙ্গে মুছে দিয়েছিলেন তুর্কীবাহিনীর হাতে গৌড়সম্রাট লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের কলঙ্ক। তবু তাঁর কথা খুব বেশি মনে রাখেনি বাংলার ইতিহাস। সেদিনের বিবরণী লিখে গেছেন সে আমলেরই এক তুর্কী ঐতিহাসিক মিনহাজ-উল-সিরাজ। বোধকরি এই বীর মানুষটির কথা তিনি না লিখে পারেননি।

ইতিহাসে পৃথুকে কামরূপরাজ বলা হলেও তিনি ছিলেন বাঙালী। উত্তরবঙ্গ আর কামরূপের বেশ কিছু অঞ্চল জুড়ে তাঁর রাজ্য ছিল।

সেটা বখতিয়ার খিলজীর বাংলা অভিযানের কাল। এই মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের জন্ম ভারতের বাইরে সুদূর তুর্কদেশে। যেমন কদাকার চেহারা তেমনি ছিল মাথাভরা দুষ্ট বুদ্ধি। তুর্কী আক্রমণকারীদের দলে ভিড়ে সে হিন্দুস্থানে এসেছিল লুঠপাট করে কিছু ধনদৌলত কামাতে। সে সময় সারা দেশেই একটা টালমাটাল চলছে। সুযোগ বুঝে দিল্লী দখল করেছে কুতুবুদ্দিন আইবক। তাঁর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে বখতিয়ার একদল লুঠেরা সেনাদল গড়ে উত্তর ভারতের পথ ধরে সোজা ঢুকে পড়লো প্রথমে মগধ, তারপর নদীয়ায়। বাংলার মানুষের দলাদলির সুযোগ নিয়ে একেবারে গৌড় রাজধানী লক্ষ্মণাবতী দখল করে সুলতান হয়ে বসলো।

এরপরই বখতিয়ারের মাথায় যেন ভূত চাপলো। হুঙ্কার দিয়ে বললো—এবার জয় করবো তিব্বত।

তিব্বত তখন এক রহস্যময় দেশ। অনেকেই সেখানে যেতে সাহস পেত না। কিন্তু বখতিয়ারের কথা আলাদা। তার মাথায় খেলত নানা উদ্ভট পরিকল্পনা। কাজেই আর দেরি না করে হাজার দশেক ঘোড়সওয়ার বাহিনী সাজিয়ে হুকুম দিল—চল তিব্বত।

বখতিয়ারের সেনাবাহিনীর মধ্যে যে কজন বুদ্ধিমান লোক ছিল তারা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল—সুলতান, এত জলদি কিসের? সবে তো বাংলা মুলুকের একটা অংশ জয় করেছেন। আগে জায়গাটা ভাল করে চিনুন, জানুন। এখানকার মানুষগুলো মোটেও সহজ নয়। তাছাড়া উত্তর বাংলার যে পথে যাবেন সেখানে আছে কোচ, মেচ আর থিরু নামে তিন উপজাতি। তারা দুর্ধর্ষ। সহজে হার মানে না।

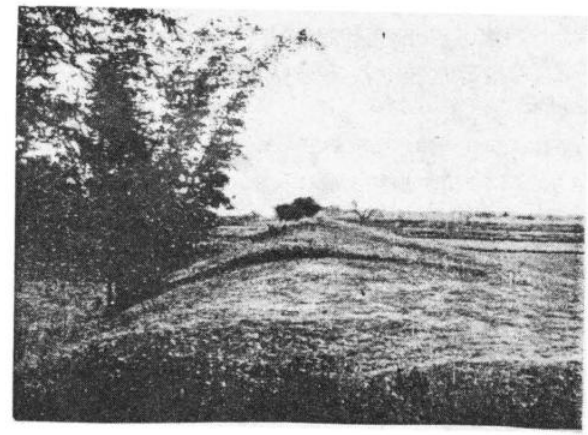

যেখানে পৃথুর গড় ছিল

কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কথা'। এক ধমকে হিতৈষী সেনানায়কদের চুপ করিয়ে দিল বখতিয়ার। তারপর ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে উঠে বসলো। পেছনে পড়ে রইলো গৌড়। রাজধানী রক্ষায় রইলো মালিক মহম্মদ নামে এক বিশ্বাসী অনুচর।

বখতিয়ারের দশ হাজার অশ্বারোহী ঘোড়া ধেয়ে চলেছে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আলি মেচ নামে এক মেচ সর্দার। দিনের পর দিন পথ চলে সেনাদল এসে পৌঁছলো কামরূপ রাজ্যসীমানায়।

সামনেই বিশাল বাঘমতী নদী। তার ওপর একটা প্রাচীন সেতু। বখতিয়ার সেনাবাহিনী নিয়ে সেই সেতু পেরিয়ে গেল। তারপর থেকেই তার দুর্ভাগ্যের পালা শুরু। প্রথম অন্তরায় কামরূপরাজ পৃথু।

বখতিয়ার কামরূপ রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁছতেই রাজা পৃথু তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হাতে কিছু উপহার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বখতিয়ারের কাছে। তারা বখতিয়ারকে জানাল কামরূপরাজের বার্তা। রাজা পৃথু বলেছেন বখতিয়ার যেন এখনই তিব্বত আক্রমণ করতে না যান। কারণ সময়টা ভাল নয়। বরং পরের বছর যদি অভিযান করেন তাহলে কামরূপরাজ নিজে সৈন্য নিয়ে তাঁকে সাহায্য করবেন।

আসলে এটা ছিল কামরূপরাজের একটা চাল। তিনি জানতেন খুব শীঘ্র তাঁর রাজ্যও আক্রমণ করবে এই তুর্কীনায়ক। ওই মুহূর্তে বখতিয়ারের দশ হাজার অশ্বারোহী সেনার মুখোমুখি হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই ব্যাপারটা অন্যভাবে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করলেন তিনি। নিজের বাহিনী প্রস্তুত করতে কিছুটা সময়ের দরকার ছিল তাঁর।

বখতিয়ার কিন্তু কামরূপরাজের পরামর্শে কান দিল না। অবশ্য তাঁর রাজ্যটাও তক্ষুণি আক্রমণ করলো না। দুজন সেনানায়ককে সেতু রক্ষা করার আদেশ দিয়ে সে তিব্বতের পথেই যাত্রা করলো। পথপ্রদর্শক আলি মেচ বিদায় নিল সেখান থেকেই।

এক সময় বখতিয়ারের বাহিনী উত্তরের সমতল ভূমি ছেড়ে প্রবেশ করলো হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে।

এদিকে রাজা পৃথুও বসে নেই। তিনি যুদ্ধের নতুন ছক বানিয়ে ফেললেন।

সেই মতো আগেই তিনি দ্রুত অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে দিলেন প্রথমে তিব্বতরাজ, তারপর আরও উত্তরে মোঙ্গলবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে। হানাদার বখতিয়ারের যুদ্ধের সাধ ভালভাবেই মেটাতে হবে। ভাঙতে হবে তার দিগ্বিজয়ের দর্প।

বখতিয়ার কিন্তু এসব কিছুই টের পায়নি। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি! বখতিয়ার চলতে চলতে অবাক হয়। কেউ তার গতিরোধ করছে না কেন ? চারিদিকের পাহাড়ী গ্রামগুলো কেমন যেন সুনসান। তারই মধ্যে যে কটা নিরীহ লোক পাওয়া গেল তাদেরই হত্যা করলো বখতিয়ারের সৈন্যরা। ভেঙে তছনছ করলো কুঁড়েগুলো। এতেই তাদের আনন্দ।

বখতিয়ার মনে মনে ভাবলো তার মতো পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ীর আসার সংবাদ শুনেই তিব্বতীগুলো পালিয়েছে। বেশ খুশি মনে সৈন্যসামন্ত নিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে চলছিল তুর্কীনায়ক। কিন্তু তার খুশি খুব বেশিদিন বজায় রইলো না।

প্রায় ষোল দিন পথ চলার পর বখতিয়ার একটি সমতল জায়গায় এসে হাজির হলো। কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে একটি দুর্গ। নিশ্চয়ই তিব্বতীদের। এইবার তাহলে যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এল। বখতিয়ার তার পথশ্রান্ত সৈন্যদের আদেশ দিল যে রাতটা বিশ্রাম করে পরদিনই ওই দুর্গ আক্রমণ করতে।

দ্রাম্....দ্রাম্....দ্রাম্....দ্রাম্....হঠাৎ ওপক্ষ থেকে বেজে উঠলো যুদ্ধের ঢাক। রাত আর পোহালো না। তার আগেই বাঁশের তৈরি বর্শা আর তীর-ধনুক নিয়ে হাজার হাজার যোদ্ধা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল বখতিয়ারের সৈন্যদলকে। সারাদিন যুদ্ধ চললো দুপক্ষের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ পাহাড়ী সেনাদের পরাক্রম আর সহ্য করতে পারলো না বখতিয়ারের বাহিনী। পাহাড় প্রান্তরে মৃত তুর্কী সৈন্যদের শব জমে গেল। এরই মধ্যে বখতিয়ারের কাছে নতুন বিপদের খবর এল সেখান থেকে পাঁচ পার্শং দূরে কর্মবাতান নামে নগরীতে সাড়ে তিন লাখ মোঙ্গল তীরন্দাজ সৈন্য অপেক্ষা করে আছে। পরদিন সকালেই তারা যাত্রা শুরু করবে বখতিয়ারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে।

এ খবর শুনেই বখতিয়ার আরও হতচকিত হয়ে পড়ল। তার অবস্থা হলো 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' ! কিন্তু পালানো কি অতই সহজ! তিব্বতীরা অবশ্য বখতিয়ারকে তাড়া করে এল না, কিন্তু পালাবার সময়ে যে সমস্ত গ্রাম তাদের চোখে পড়লো সেখানে মানুষজন তো নয়ই, এমনকি এক কণা শস্য বা এক আঁটি ঘাস পর্যন্ত মিললো না। আধুনিক রণনীতিতে একেই বলে 'পোড়া মাটির নীতি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই নীতি অনুসরণ করেই সোভিয়েত বাহিনী জার্মানদের পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেছিল। আটশো বছর আগে সেই একই কৌশল অবলম্বন করে কামরূপরাজ পৃথু হানাদার তুর্কীবাহিনীকে নাজেহাল করে ছাড়লেন।

ক্ষুধার তাড়নায় বখতিয়ারের সৈন্য আর ঘোড়াগুলো যেন ক্ষেপে উঠলো। শেষ পর্যন্ত অনাহারক্লিষ্ট ঘোড়াগুলোকে মেরেই তখনকার মতো প্রাণ বাঁচালো বখতিয়ারের সৈন্যরা। ওরই মধ্যে মরলো বেশ কিছু সৈন্য।

এইভাবে পিছু হটতে হটতে বখতিয়ার সেই বাঘমতী বা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এসে পৌঁছলো। কিন্তু এখানেও এক বিভ্রাট। সেতুরক্ষাকারী সৈন্যদের কোনো পাত্তা নেই। সেতুটাও কারা যেন ভেঙে দিয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, এটাও সেই কামরূপরাজের কীর্তি।

অনেক খুঁজেও নদী পার হবার অন্য কোনো সেতু বা একটা নৌকাও পাওয়া গেল না। আর ঠিক তখুনি বখতিয়ারের চোখে পড়লো কিছুদূরে সুন্দর একটা দেবমন্দির। খোঁজ নিয়ে সে জানলো মন্দিরের ভেতরে নিখাদ সোনার তৈরি বিরাট একটি বিগ্রহ ছাড়া আরও কয়েকটি ছোটখাট স্বর্ণবিগ্রহ আছে।

এই অবস্থার মধ্যেও লোভ সামলাতে পারলো না তুর্কীনায়ক। সঙ্গীদের কাঠ আর দড়ি সংগ্রহ করে নদী পার হবার ভেলা তৈরির আদেশ দিয়ে সে ঢুকলো মন্দিরের মধ্যে স্বর্ণভাণ্ডার লুঠ করতে।

সেটাই হলো বখতিয়ারের চরম সর্বনাশের হেতু। রাজা পৃথুর সৈন্যরা সব সময় তার ওপর নজর রেখেছিল। মন্দিরে ঢুকতেই বিশাল সেনাদল এসে তাকে ঘিরে ফেললো। এবার বুঝি তার নিশ্চিত মৃত্যু।

কিন্তু মৃত্যু তার এত তাড়াতাড়ি হলো না। কোনোরকমে অবরোধ-মুক্ত হয়ে বখতিয়ার সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘমতীর জলে। সাঁতরেই বাঘমতী পার হবে তারা। কিন্তু সেই পাহাড়ী নদী সাঁতরে পার হবার ক্ষমতা বখতিয়ারের সৈন্যদের ছিল না। নদীর মাঝামাঝি পৌঁছতেই বেশির ভাগ সৈন্য স্রোতের টানে ভেসে গেল। অল্প কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার ফিরে এল দেবীকোটে। ততদিনে দিগ্বিজয়ী সুলতান হবার স্বপ্ন তার চিরকালের জন্যে মুছে গেছে।

এরপর বখতিয়ার যে কটা দিন বেঁচেছিল, লজ্জা আর অপমানে কারুর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারত না। তিব্বত অভিযানকালে যে সব সৈন্যরা নিহত হয়েছিল তাদের স্ত্রী-পুত্ররা বখতিয়ারকে দেখলেই চিৎকার করে অভিশাপ আর গালাগালি দিত। খুব শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়লো বখতিয়ার। কিছুদিন বাদেই ঘাতকের ছুরিকাঘাতে তার মৃত্যু হলো। শেষ হলো বাংলার প্রথম তুর্কী আক্রমণকারীর বিড়ম্বিত জীবন।

আর কামরূপের সেই বাঙালী রাজা ? আজ তিনি উপেক্ষিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় !

# জিজ্ঞাসা

প্রশ্নঃ

১। ব্যাঙ কি মানুষ মারতে পারে?

২। কোন জাতের কাঁকড়ার দেহে শক্ত খোল নেই? কেমন করে তারা নিজেদের নরম দেহকে রক্ষা করে?

৩। আগুনের সাহায্যে কোন গাছ অঙ্কুরিত হয়?

৪। পৃথিবীর সবথেকে দুর্লভ পাখি কোনটি?

৫। কোন খনিজ পদার্থ ছুঁলে সাবানের মতো লাগে?

৬। ঘোড়াদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করার বিরুদ্ধে যিনি সোচ্চার ছিলেন তিনিই ঘোড়াকে প্রধান চরিত্র করে একটি বই লিখেছিলেন? সেই ব্যক্তি এবং তাঁর লেখা বইয়ের নাম কি?

উত্তরঃ

১। হ্যাঁ, পারে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় একজাতের উজ্জ্বল রঙচঙে ব্যাঙ পাওয়া যায় যারা খুবই বিষাক্ত। বৃষ্টি অরণ্যের আদিবাসীরা এদের বিষ সংগ্রহ করে তীরের মুখে মাখিয়ে নেয়। এই ব্যাঙদের মধ্যে সবথেকে বিষাক্ত কলোম্বিয়ার 'কোকয়'। লম্বায় মাত্র ১ ইঞ্চি হলেও এ জাতের এক একটা ব্যাঙের চামড়া থেকে ৫০ জন মানুষ মারার মতো বিষ পাওয়া যেতে পারে।

২। হারমিট ক্রাব। অন্য কাঁকড়াদের মতো এদের শক্ত খোল নেই। তাই নিজের নরম শরীরকে বাঁচাতে এরা শামুক জাতীয় প্রাণীদের পরিত্যক্ত খোলে আশ্রয় নেয়। খোলের মধ্যে ঢুকে শুধু মাথা আর পাগুলো বের করে এরা সমুদ্রতলে ঘুরে ঘুরে খাবার সন্ধান করে ফেরে।

৩। অস্ট্রেলিয়ার আধা মরুভূমি অঞ্চলের ব্যাঙ্কসিয়া গাছ। ওসব অঞ্চলের ঝোপেঝাড়ে আগুন লাগলে তবেই এই গাছের বীজ ফেটে অঙ্কুরিত হয়।

৪। হাওয়াই দ্বীপের ও-য়া-আ নামে একটি পাখি। পৃথিবীতে ১৯৭৭ সালে এই পাখির সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি।

৫। ট্যাল্ক বা সোপস্টোন।

৬। অ্যানা সিওয়েল। বইয়ের নাম ব্ল্যাক বিউটি।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

# মাঠের বাইরে বিলির কাকিমা ।। ছেলেরা কিন্তু তাদের সেরা খেলোয়াড়কে হারাতে চায় না

# বিলির বুট

**বিলি প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড সটের একজোড়া পুরনো বুট খুঁজে পেয়েছে। বুটটা পরে খেললেই ওর খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। বড়দিনের ছুটিতে বিলি তার কাকার কাছে এসেছে। কাকিমা ফুটবল খেলা ভীষণ অপছন্দ করেন। কিন্তু বিলি ওয়েভিল রোড রেঞ্জার্স দলের হয়ে খেলতে নামলো। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো। জল-কাদা মেখে বিলি খেলছিলো। হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন বিলির কাকা আর কাকিমা...**

ঐ ছেলেটার খেলা দেখতে দেখতে কার কথা মনে পড়ছে জানো ? ডেড সট কিনের। ছোটবেলায় সেও এখানে খেলতো।
তারপর কিন কতো বড় খেলোয়াড় হয়েছিলো জানো তো ? সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় !
বিলি, এইদিকে।
দারুণ গোল !
ছেলেটার খেলা দেখে মনে হচ্ছে, ও-ও একসময় মস্ত বড় খেলোয়াড় হবে। আর আশ্চর্য ! ওকে দেখতে অনেকটাই ছোটবেলার কিনের মতো !
বিলির দেওয়া দু গোলে জিতলো ওয়েভিল রোড রেঞ্জার্স।
বিলি !
আমাদের হয়ে আবার খেলবে তো ?
কি করে খেলবো। আমি তো এখানে থাকি না। ছুটিতে এসেছিলাম। শনিবার চলে যাবো। আমায় খেলতে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।
খেলা শেষ হয়ে গেছে। কাকিমার কথা মনে করে বিলি ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরছে..
কাকিমা যদি আমার জন্যে অপেক্ষা না করেন তাহলেই বাঁচি। বুট দুটো শোবার ঘরের জানলায় ঝুলিয়ে রেখে ঘরে ঢুকবো। পরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে নেবো।
দিব্যি হয়েছে। এটা এখানেই ঝুলুক।
ঘরে কেউ নেই দেখে বিলি ঢুকে পড়লো। কিন্তু বুটটা টেনে তুলতে গিয়েই...
এই রে ! নিশ্চয়ই বাঁধাটা ঠিক হয়নি। ব্যাগটা নিচে পড়ে গেলো।
আর তারপরই...
তুমি নিশ্চয়ই এগুলো খুঁজছো... এগুলো তুমি আর পাবে না...বারণ না শুনে তুমিই যে ফুটবল খেলছিলে তা আমি জানি !
এই রে !
এই দুটো তুমি আর পাবে না। আমি পুড়িয়ে ফেলবো !
না... ও কাকিমা না...
ডেড সটের বুট কি পুড়ে যাবে ? জানতে পারবে ভাদ্র সংখ্যায়।

# গোপালদাদার গল্প

## শান্তি সিংহ

কোনো গাঁয়ে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ। সাদাসিধে নির্লোভ মানুষটি পড়াশুনা আর পুরুতগিরি নিয়েই পরম সুখে দিন কাটাতেন। সংসারে আয় তেমন না থাকলেও ব্রাহ্মণের মনে কোনো দুঃখ ছিল না। কারণ, তিনি নিজেকে গরিব ভাবতেন না। পৈতৃক ভিটেয় ছিল ছিমছাম মাটির ঘর। ঘরের দুপাশে আম, নারকেল, লিচু গাছ। পিছনে মস্ত একটা বাঁশের ঝাড়। কোনো যজমানের কাছে দানে-পাওয়া এক টুকরো ধানী জমিও ছিল।

ব্রাহ্মণী ছিলেন ভারী ভক্তিমতি, খুব ভোরে উঠে নদীতে যেতেন স্নানে। ঘরে আসার পথে ঠাকুরপুজোর জন্য তুলে আনতেন নানান ফুল। তারপর সাতসকালে কাচা কাপড় পরে বসতেন পুজোয়। কাঠের সিংহাসনে পিতলের ছোট গোপাল ঠাকুরকে যত্ন করে ফুল দিয়ে সাজাতেন। মনে মনে ভাবতেন ছোট্ট গোপাল যেন তাঁর কত আপনার। বিভোর হয়ে ব্রাহ্মণী গান ধরতেন। তাঁর দুচোখ ছাপিয়ে নামত আনন্দের ধারা।

একদিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সংসার আলো করে জন্মাল এক পুত্র। ব্রাহ্মণ বললেন—ওগো ব্রাহ্মণী, এতদিনে বুঝি গোপাল ঠাকুর সত্যি সত্যি তোমার কোলে এলেন। ছেলের নাম দিই গোপাল।

ব্রাহ্মণীও খুশি। হেসে বললেন—এই ছোট্ট সোনামণি, তার গোপাল দাদার ছোট ভাই আরেক গোপাল!

এত সুখের মাঝে হঠাৎ ঘটল অঘটন। ক'দিনের অসুখে ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। ব্রাহ্মণী শিশুপুত্রকে নিয়ে পড়লেন অগাধ জলে। কিন্তু ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস হারালেন না। জমির সামান্য ধান, আর যজমানদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার দান দিয়েই তাঁর দিন কাটত। তার উপর প্রতিদিন অনেকটা সময় তিনি চরকায় সুতো কাটতেন। সেই সুতো বেচেও অল্প আয় হতো তাঁর।

দিন যায়। গোপাল বড় হয়। এবার তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। গাঁয়ে পাঠশালা না থাকায় শুভদিন দেখে ব্রাহ্মণী ছেলেকে পাশের গাঁয়ের পাঠশালায় ভর্তি করলেন। প্রথম কয়েক দিন গোপালকে তিনি পাঠশালায় পৌঁছে দিলেন। ছুটি হতে আবার নিয়ে এলেন। তারপর গোপাল একা একাই যাওয়া-আসা শুরু করল।

সকাল-বিকেল দুবেলা পাঠশালা বসত। শীতের দিনে গোপালের বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হতো। পথে পড়ত খানিকটা বন। সেই বনপথে হাঁটতে ছোট্ট ছেলে গোপালের গা ছমছম করত। একদিন তাই সে তার মাকে বলে—মা, বনের পথ দিয়ে একা একা যাওয়া-আসা করতে বড় ভয় করে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে। আমায় কেন কেউ সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসে না, মা?

ছেলের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর চোখে জল এল। যদি আজ গোপালের বাবা বেঁচে থাকতেন! মায়ের চোখে জল দেখে ছেলে বলল—মা, তুমি কাঁদছ?

চোখের জল মুছে মা বললেন—না বাবা, তুমি ভেবো না। পথে যখন তোমার ভয় করবে, তখন তুমি তোমার গোপালদাদাকে ডাকবে। ওই বনে আমার আরেক ছেলে থাকে, তার নামও গোপাল। সে তোমার বড় ভাই।

ছেলে মায়ের কথা সরল মনে বিশ্বাস করল। পরের দিন পাঠশালা থেকে ফিরছে গোপাল। বনপথে নির্জনতায় তার ভয় হলো। তক্ষুণি মনে পড়ল মায়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে সে ডাক দিল—ও গোপাল দা-দা-আ, তুমি কোথায় আছ—অ? মা বলেছে, তুমি বনে থাক, তোমায় ডাকতে। একলাটি আমার বড় ভয় করছে যে!

দূর বনান্তরাল থেকে মধুর কণ্ঠে ভেসে এল—ভয় নেই ভাই, এই তো আমি রয়েছি। ভয় কিসের? তুমি ঠিকমত বাড়ি যাও।

সেদিন থেকে নির্জন বনপথে গোপাল তার বনের দাদাকে ডাকে, আর একই রকম গলার স্বর শুনতে পায়। বাড়ি এসে মাকে বলে সব কথা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মা শোনেন সে কাহিনী। তারপর একদিন ছেলেকে মা বললেন—বাছা, এরপর যখন তোমার গোপালদাদার সঙ্গে কথা হবে, তখন তাকে বলো, সে যেন তোমায় দেখা দেয়।

পরের দিন গোপাল বনপথে যাওয়ার সময় তার গোপালদাদাকে ডাক দিল। উত্তরও পেল। তখন সে বলল—গোপালদাদা, তোমায় তো আমি কোনোদিন দেখিনি। আজ আমায় দেখা দাও।

বনান্তরাল থেকে গোপালদাদা বলল—ভাই, এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি। আজ তো আসতে পারব না।

কিন্তু গোপাল নাছোড়বান্দা। দাদাকে দেখার জন্য কান্নাকাটি শুরু করল। অগত্যা বনের ভেতর দেখা দিলেন গোপালদাদা। রাখালের বেশ। মাথায় মুকুট। তাতে শোভা পাচ্ছে ময়ূরের পালক। হাতে মোহনবাঁশি।

দাদাকে দেখে গোপাল খুব খুশি। দুজনে একসঙ্গে খেলা করল, গাছে চড়ল, ফুল-ফল পাড়ল। খেলার আনন্দে কেটে গেল অনেকটা সময়। অবশেষে দাদার কথামত ছোট ভাই দৌড়তে দৌড়তে গেল পাঠশালা।

সেদিন গোপালের পড়ায় মন নেই। ঘন ঘন ভুল হচ্ছে আঁক কষতে। তার মন পড়ে আছে গোপালদাদার কাছে। আবার কখন বিকেল হবে! দাদার সঙ্গে জমবে খেলা।

পাঠশালায় লেখাপড়া আর বনপথে খেলা-খেলা আনন্দে গোপালের দিনগুলি তরতরিয়ে কাটতে লাগল। গোপালের মা ছেলের মুখে শোনেন তার গোপালদাদার কথা। ভক্তি ও ভালোবাসায় বারে বারে রোমাঞ্চিত হয় দেহ। প্রাণের ঠাকুরের কাছে প্রতিদিন মনের দুঃখ সংগোপনে নিবেদন করেন।

পাঠশালার গুরুমশায়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। ছাত্রদের অনেকে দিয়েছে আগাম টাকা বা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। কিন্তু দুঃখিনী বিধবার পুত্র গোপাল কী দেবে? তাই তার মন খুব ভার।

রাতে গোপাল মাকে জানাল তার দুঃখের কথা। মা চুপ করে শুনলেন। মনে মনে ভাবলেন, চিরদিন তো গোপালরূপী কৃষ্ণের ওপরই ভরসা করে এসেছি, এবারও তাই করব। ছেলেকে বললেন—বাবা, এর জন্যে ভাবনা কী? কাল যখন পাঠশালায় যাবে, তখন মনের কথা তোমার গোপালদাদাকে জানাবে। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, কেমন?

পরদিন পাঠশালা যাওয়ার পথে নির্জন বনে গোপাল ডাকল তার গোপালদাদাকে। যথারীতি তার কাছে এল গোপালদাদা। দুজনে কিছুক্ষণ মনের আনন্দে খেলা করল। খেলার শেষে গোপাল বলল—গোপালদাদা, আমাদের পাঠশালায় গুরুমশায়ের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে। আমার বন্ধুরা কেউ টাকা, কেউ বা নানারকম জিনিস দিয়েছে। আমার কিছুই দেওয়া হয়নি। মা বলেছে একথা তোমাকে জানাতে।

গোপালদাদা হেসে বলল—ভাই গোপাল, আমি তো বনের সামান্য রাখাল। গরু চরাই। আমার তো টাকা-পয়সা নেই। তবে তোমার গোপালদাদার উপহার হিসেবে এই ছোট্ট ক্ষীরের বাটিটা নাও, তোমার গুরুমশায়কে দিও।

গোপালের আনন্দ আর ধরে না। ছুটতে ছুটতে সে পাঠশালায় এল। এসে দেখে কিছু ছাত্র সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে একে একে গুরুমশায়ের হাতে তুলে দিচ্ছে দামী দামী সব উপহার। গোপালের মন ভীষণ দমে গেল। তার হাতে তো দামী উপহার নেই! চোখে জল এসে গেল গোপালের।

গুরুমশাই সস্নেহে বললেন, কিরে চোখে জল কেন?

হঠাৎ গুরুমশায়ের নজর পড়ল তার ওপর। সস্নেহে তিনি বললেন—কীরে গোপাল, চোখে জল কেন? কাছে আয়।

আড়ষ্টভাবে গোপাল এগিয়ে এল। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে গুরুমশায়ের হাতে তুলে দিল গোপালদাদার দেওয়া ক্ষীরের ছোট্ট বাটিটা। গুরুমশায় সেটা নিয়ে ঢেলে দিলেন অন্য একটা বড় পাত্রে। কিন্তু একি! মুহূর্তে বাটিটা যে ক্ষীরে ভরে উঠল। গুরুমশায় আবার বাটিটা উপুড় করলেন। বড়ো পাত্রটাতে ক্ষীর ফের ঝরে পড়ল। কিন্তু নিমেষে ছোট্ট বাটিটাও ক্ষীরে টইটুম্বুর! গুরুমশায় যতবারই ঢালেন, ততবারই সেটা ভরে ওঠে ক্ষীরে।

শুধু গুরুমশায় নয়, অবাক সকলেই। তখন গভীর আবেগে গুরুমশায় গোপালকে কোলে তুলে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে গোপাল, এই অপরূপ বাটিটা তুই কোথায় পেলি বাবা?

গোপাল সরল মনে সব কথা খুলে বলল। শুনে গুরুমশায় বললেন—হ্যাঁ বাবা গোপাল, তোর গোপালদাদাকে একবার দেখাবি আমায়?

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল গোপাল। সেদিন পাঠশালা ছুটির পর গুরুমশাই চললেন গোপালের সঙ্গে। খানিকটা হেঁটে বনের মধ্যে সুঁড়িপথ শুরু। সেই সুনশান পরিবেশে গোপাল ডাকল তার গোপালদাদাকে। কিন্তু বারবার ডেকেও কোনো সাড়া পেল না। প্রথমে অবাক, পরে ভীষণ অভিমান হলো গোপালের। কাঁদতে কাঁদতে সে তখন বলল—ও গোপালদাদা, তুমি আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না কেন? তুমি সাড়া না দিলে গুরুমশায় আমাকে মিথ্যেবাদী ভাববেন যে!

গভীর বনভূমি থেকে ভেসে এল সেই সুমধুর স্বর—ভাই, তোমার আর তোমার মায়ের ভক্তি-বিশ্বাসের টানেই আমি তোমার কাছে যাই। কিন্তু তোমার গুরুমশায়ের তো সে বিশ্বাস নেই। তাই আমার দেখা পেতে এখনো অনেক দেরি।

একথা শুনে গোপাললদাদার ওপর দারুণ অভিমান হলো গোপালের। মাথা হেঁট করে গুরুমশায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে তাঁর চোখে জলের ধারা।

ছবি: গৌতম চক্রবর্তী

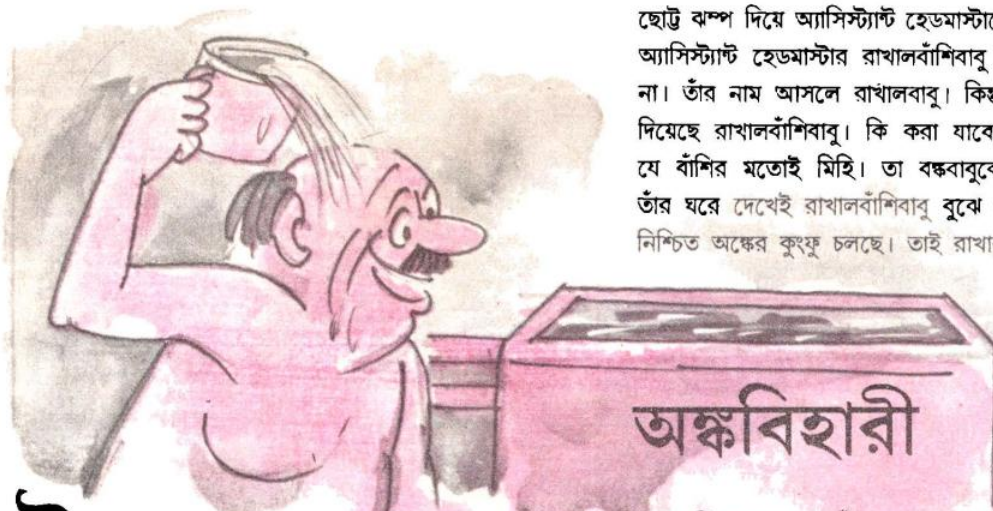

# অঙ্কবিহারী

বলরাম বসাক

স্কুলের ছেলেরা অঙ্ক-স্যারের নাম দিয়েছে 'অঙ্কবিহারী'। সব্বাই, এমন কি সতীর্থ মাস্টারমশাইরাও বলেছেন বাহ্, উপযুক্ত নাম হয়েছে।

আসলে স্যারের প্রকৃত নাম 'বঙ্কবিহারী'। আর সে নামটা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই খুব হিট করেছিল। কারণ ছেলেবেলায় তিনি অঙ্ক দেখলেই বঙ্ক হয়ে যেতেন। তাইতে তখনকার মাস্টারমশাই নরহরিবাবু তাঁকে বলেছিলেন, সাবাস বঙ্কবিহারী, নামের মর্যাদা রেখেছিস। দেখিস নামটা যেন বদলে না যায়।

হ্যাঁ, অনেকদিন পর্যন্ত নামটা বদলায়নি। কারণ অনেকদিন পর্যন্ত তিনি অঙ্কের ধারেকাছে যাননি। এমন কি যখন থেকে স্কুলে চাকরি করতে এলেন ইতিহাস-ভূগোলের মাস্টারমশাই হিসেবে, তখনও তিনি অন্য মাস্টারমশাইদের কাছে বঙ্কবিহারীবাবু বা বাঁকা বাবু। আর ছাত্রদের কাছে বঙ্ক স্যার। অঙ্ক তখনও তাঁর কাছে বিশেষ আশঙ্কার বিষয় ছিল। অঙ্কের বই ছুঁতেন না। অঙ্কের ক্লাস ভুলেও নিতেন না। অন্য কারও ক্লাসে চট করে ঢুকতেন না। চুপি চুপি কান পেতে শুনে নিতেন অঙ্কের ক্লাস হচ্ছে কিনা। হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন।

টিচার্স রুমে টিফিন টাইমে শিক্ষকদের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ আলোচনা', মানে টেবিলে কিল চড় মেরে তর্কাতর্কি শুরু হলেই বিশ হাত দূরে বসে বঙ্কবাবু প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতেন 'শান্তিপূর্ণ আলোচনা'র বিষয়টা কী? 'শ-ষ-স'-এর উচ্চারণ নিয়ে? নাকি কোনো একটা ইংরিজি শব্দের বানান নিয়ে? নাকি ফিজিক্স বড় না কেমিস্ট্রি বড় তাই নিয়ে? নাকি আলেকজান্ডার মগধ জয় করতে চাননি গঙ্গার ইলিশ খেয়ে? বা গাভাস্কারের ব্যাটের ওজন বেশি না তেণ্ডুলকারের ব্যাটের ওজন বেশি? বা বেদে পাঁউরুটি প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে একটা শ্লোক ছিল কি ছিল না? ইত্যাদি ইত্যাদি ধরনের। এসব বিষয় হলে বঙ্কবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন। কিন্তু তর্কের বিষয়টা যদি অঙ্ক হতো তো—

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে বঙ্কবাবু একটা লম্বা লম্ফ ও আরেকটি ছোট্ট ঝম্প দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকে পড়তেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার রাখালবাঁশিবাবু মোটেই চমকে উঠতেন না। তাঁর নাম আসলে রাখালবাবু। কিন্তু ইস্কুলের ছেলেরা নাম দিয়েছে রাখালবাঁশিবাবু। কি করা যাবে, তাঁর গলার আওয়াজ যে বাঁশির মতোই মিহি। তা বঙ্কবাবুকে অমন হাঁকপাক করে তাঁর ঘরে দেখেই রাখালবাঁশিবাবু বুঝে যেতেন যে টিচার্স রুমে নিশ্চিত অঙ্কের কুংফু চলছে। তাই রাখালবাঁশিবাবু কোনো দিকে না তাকিয়ে একমনে হাঁ-করা মুখের মধ্যে দশটা-বিশটা বাতাসা ছুঁড়ে দিয়ে টিফিন সারতে ব্যস্ত থাকতেন।

অবশ্য প্রথম বার যেদিন অঙ্ক-ভীত বঙ্কবিহারীবাবু তাঁর ঘরে লম্ফঝম্প দিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন, সেদিন তিনি রীতিমত চমকে উঠেছিলেন। হাঁ-করা মুখে তেত্রিশ সেকেন্ড বাতাসা বর্ষণ বন্ধ রেখে তাঁকে বলতে হয়েছিল, বঙ্কবাবু, আতঙ্ক কিসের?

ওখানে স্যার অঙ্ক নিয়ে ইয়ে—মানে ইয়ে....

ও, আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে বসুন। বলেই রাখালবাঁশিবাবু বাতাসা চিবুতে চিবুতে ফের ঘাড় ফিরিয়ে বলেছিলেন, দুটো-একটা চিবুবেন?

সেই বঙ্ক স্যার হঠাৎ তিন মাস বেপাত্তা। কেউ তাঁকে খুঁজে পেল না। তাঁর বাড়িতে তো পাওয়া গেলই না, চায়ের দোকানেও না। খেলার মাঠে, পাড়ার ক্লাবে, কোচিং ইস্কুলে, এমন কি যে দু-দশটা বাড়িতে টিউশনি করতেন কোথাওই না। গেলেন কোথায়?

বঙ্কবাবুর বাড়িতে থাকেন তাঁর স্ত্রী, তিনটি বিড়াল আর দুটো টিয়া পাখি। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বহুদিন আগে। তাই বাড়িতে অঙ্ক শিখবে এমন কেউই নেই।

ইস্কুল থেকে হেডমাস্টার প্রপঞ্চভঞ্জনবাবু কয়েক জন মাস্টারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্কবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন খোঁজ-খবর করতে। বঙ্কবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি বাজার খরচার হিসাব-টিসাব কষতে দিয়েছিলেন বঙ্কবিহারীবাবুকে?

তা কখনো দিই? বঙ্কবাবুর স্ত্রী জানালেন, বাজার, রেশন, কেরোসিন, গ্যাস-ফ্যাস সব আমিই করি। ওঁকে অঙ্কের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিই না।

তাহলে গেলেন কোথায়? মেয়ের বাড়ি যাননি তো?

মেয়ের বাড়ি যাবার ওঁর কোনো উপায়ই নেই, বললেন বঙ্কবাবুর স্ত্রী।

কেন! উপায় নেই কেন?

সেই কারণটাও ক্রমে ক্রমে জানা গেল। সেখানে নাতি তিপু তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করে থাকে। সে প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল, 'ময়ূর সিংহাসনের দাম কত ডলার?' প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গিয়ে বঙ্কবাবু বুঝতে পারেননি যে বিরাট এক অঙ্কের ঝামেলা পোহাতে হবে। কোচিং-ইস্কুলের সতীর্থ অঙ্ক-স্যার শ্রীচরণবাবু নাকি উত্তরটার একটা সহজ হিন্টস দিয়েছিলেন এইভাবে—

ময়ূরের জন্যে রাজস্থান বৃন্দাবন যাওয়ার দরকার কি? বরং এখানেই একটা ময়ূর ইক্যুয়ালটু কটা ব্রয়লার মুরগি ঠিক করে নিতে হবে। বাজারে মুরগির দাম জেনে নিয়ে অঙ্ক কষে ময়ূরের দাম বের করে ফেলতে হবে। ময়ূরের দাম জানা হয়ে গেলে, ময়ূরের পালক ও পুচ্ছের দাম বেরিয়ে যাবে। মাংসটা ফাউ। ময়ূর-সিংহাসনে কটা ময়ূর লেগেছিল জেনে নিয়ে তত সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে। সিংহাসনটা পাকা সোনার ছিল না গিনি সোনার জানতে হবে। তারপর জানতে হবে সোনার ভরী এখন কত চলছে। আর সিংহাসনের আইডিয়া? ডেকরেটরদের কাছ থেকে ভাড়া পাওয়া যায় যাত্রা-থিয়েটারের জন্যে। ক্রয়মূল্যের দেড় পার্সেন্ট যদি ভাড়া যোগ হয় আর ভাড়া যদি সাড়ে তিনশ টাকা হয় তাহলে সবটা কষে তাতে যোগ করতে হবে মজুরি প্লাস পরিবহন খরচা প্লাস কুলি খরচা। তাকে সাড়ে বত্রিশ টাকা ইক্যুয়ালটু এক ডলার দিয়ে ভাগ .....

আর অপেক্ষা করেননি, আগেই ভেগে পড়েছিলেন বঙ্কবাবু সেখান থেকে। প্রশ্নটার সমাধান হয়নি বলে নাতির সামনা-সামনি হবার ভয়ে মেয়ের বাড়িতেও আর যান না।

তাহলে গেলেন কোথায়?

কোথায় আর যাবেন? বললেন বঙ্কবাবুর স্ত্রী, ফিরে তাঁকে আসতেই হবে।

জোর দিয়ে বলছেন?

জোর দিয়ে বলছি। যেখানেই থাকুন অঙ্কের হাত থেকে রেহাই আছে? যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ-ভগ্নাংশের পাল্লায় পড়তেই হবে।

তা যা বলেছেন! হোটেলে খেতে গেলেও কত টাকার বিল হলো তার জন্যে যোগ করতে হবে। পঞ্চাশ টাকার নোট থেকে কত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে বিয়োগ করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত বঙ্কবাবুর স্ত্রীর কথাই অর্ধেক ফলল। বঙ্কবিহারীবাবু তিন মাসের মধ্যে ফিরে এলেন। তবে বাকি অর্ধেক ফলেনি। অর্থাৎ উনি অঙ্কের ভয়ে ফিরে আসেননি। বরং অঙ্কটঙ্ক গিলে খেয়ে হজম করে অঙ্কের সালসায় একেবারে বলীয়ান হয়ে ফিরেছেন। ইস্কুলে ঢুকেই এক হুঙ্কার কিংবা টঙ্কার, কোথায় অঙ্ক? হেডমাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, অন্যান্য মাস্টারমশাই যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সবাই বঙ্কবাবুকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠলেন। কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না। একজন মাস্টারমশাই আস্তে করে বললেন, বাঁকাবাবু, চুল কি হলো? তিন মাস বাদে কোথা থেকে এত্ত বড় একটা টাক বানিয়ে নিয়ে এলেন?

না, একটুও হাসলেন না বঙ্কবাবু। বরং টেকো মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, কী সুন্দর ভাগ মিলিয়ে দিয়েছে এই মাথাটা! তারপরই মুখখানায় পিচকারি দিয়ে রঙ ছড়িয়ে দেবার মতো হাসি ছড়িয়ে দিলেন। বললেন, ওহ্, মাথায় চুল না থাকাটা একটা দারুণ ভাগ অঙ্ক, জানেন না বুঝি ডম্বরুবাবু...

ডম্বরুবাবু উঁচু ক্লাসের জাঁদরেল অঙ্কের মাস্টারমশাই। ইস্কুলে তিনি একাই একশ। অত্যন্ত জটিল জ্যামিতি আর বীজগণিত নিয়েই মশগুল থাকেন। বঙ্কবাবু মাথায় চুল না থাকাটা কেন ভাগ অঙ্ক বলে দিলেন বুঝতে না পেরে থুতনিতে হাত বুলিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। পরে আস্তে আস্তে বললেন, মানে আপনি কি বলতে চান গোলাকার চুলশূন্য মাথাটাকে যে কোনো প্রকারের কৌণিক বিভাজনের বা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ করতে করতে অসীম বহুভুজের কৌণিক অন্তর্বিভাজনের একটা ফল হিসেবে...

নট কারেক্ট, নট কারেক্ট, চেঁচিয়ে উঠলেন বঙ্কবাবু, মাথায় চুল না থাকা মানে যত সংখ্যক চুল আছে, তত সংখ্যক চুল দিয়ে ভাগ দেওয়া। ভাগফল এক মানে টাক। অল্পবিস্তর টাক নয়, পরম টাক। একমেব অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম।

হেডমাস্টার প্রপঞ্চভঞ্জনবাবু গলাখাঁকারি দিতে দিতে নিজের ঘরে চলে যাচ্ছেন দেখে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার রাখালবাঁশিবাবুও নিজের ঘরের দিকে চলে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন। তাঁর সামনে হাত নেড়ে বঙ্কবাবু বলে উঠলেন, ওসব ইতিহাস-পাতিহাঁস ভূগোল-মাথা গোল আর পড়াব না। এবার থেকে খালি অঙ্ক পড়াব।

ভয়ে ভয়ে রাখালবাঁশিবাবু বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

সেই থেকে বঙ্কবাবু অঙ্ক স্যার হয়ে গেলেন। আর তাঁর নামটাও বদলে বঙ্কবিহারী থেকে হয়ে গেল 'অঙ্কবিহারী'। কেমন করে? বঙ্কবাবু ইদানিং যেভাবে চলছেন সেটা জানতে পারলেই বোঝা যাবে কেন তিনি অঙ্কবিহারী।

রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মহা উৎসাহে পুকুরপাড়ে দৌড়তে ছোটেন। হাঁসের পিছনে ছোটাছুটি করে কত ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডে হাঁসটাকে ধরে ফেলা যায় বারবার ঘড়ি দেখে তার হিসাব কষেন। হাঁসটা ঊর্ধ্বশ্বাসে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে এদিক ওদিক ছোটে। হাঁসের মালিক ভীষণ রাগ করেন। কিন্তু রাগ করলে চলবে কেন, এ যে অঙ্ক! টাইম এন্ড ডিসট্যানসের অঙ্ক।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরেই ব্রেকফাস্ট। সেটাও একটা অঙ্ক। অর্থাৎ এক পিস পাঁউরুটি মানে আয়তক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রও হয়ে যায় মাঝে মাঝে। পাঁউরুটির মাঝখানটায় আয়তাকার মতন করে মাখন দিয়ে ঢাকলে পাঁউরুটির মাখনশূন্য অংশের ক্ষেত্রফল কত? মাখনশূন্য অংশে কামড় বসিয়ে বসিয়ে অঙ্কের উত্তরটা বের করে ফেলেন বঙ্কবাবু। কিংবা একটা ওমলেটের ক্ষেত্রফল একশ একত্রিশ বর্গ মিলিমিটার হলে ডিমের ঘনফল কত? এক সেকেন্ড অন্তর চায়ে চুমুক দিলে বারো চুমুক চা খেতে কত সেকেন্ড লাগবে?

ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলেই ব্যাগ নিয়ে বাজারে ছোটেন মহানন্দে। কারণ বাজার করা মানেই লাভ-ক্ষতির অঙ্ক। পার্সেন্টেজের অঙ্ক। ঐকিক নিয়ম। সরষের তেল কেনা মানেই মিশ্রণের অঙ্ক। একটি দুটি অঙ্ক নয়, প্রচুর অঙ্ক। এত অঙ্ক এত দাম এত খরচ যে বঙ্কবাবুর মাথা গরম হয়ে যায়! বিস্তর ঘাম ঝরে যায়।

বাড়ি ফিরে লোডশেডিং-এ বসে পাখার হাওয়া খেতে খেতে অঙ্ক কষেন যদি মাছের দর ২৫ টাকা কেজি থেকে ৩৫ টাকা কেজি হয় তাহলে কপালে অতিরিক্ত ঘামের ফোঁটা জমে ১,৩৬,৫৯১টা, ৫০ টাকা কেজি হলে অতিরিক্ত জমে ৩,৫৬,৫১৮টা, তাহলে ৬৫ টাকা কেজি হলে অতিরিক্ত ঘাম কত জমবে? বড্ড শক্ত অঙ্ক। ডম্বরুবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সোজা ঐকিক নিয়মে হবার নয়। মনে হচ্ছে হায়ার ম্যাথেম্যাটিক্সে ইনটার-পোলেশন-টোলেশন করতে হবে।

তারপরই ইস্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হন বঙ্কবাবু। স্নান করতে বাথরুমে ঢোকেন। চৌবাচ্চার জল মাথায় ঢালতে ঢালতে বঙ্কবাবু আর্কিমিডিস হয়ে যান। থেকে থেকেই ইউরেকা ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। কারণ স্নান করা মানেই চৌবাচ্চার অঙ্ক। চৌবাচ্চায় তিনটে নল লাগিয়েছেন বঙ্কবাবু মিস্ত্রি ডেকে। একটা নল দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। দুটো নল দিয়ে জল ঢোকে। প্রয়োজন হলে মিস্ত্রি ডেকে তিনি আরও কয়েকটা নল লাগাবেন। তাতে হয়তো চৌবাচ্চার জটিল অঙ্কগুলোর সমাধান হয়ে যাবে।

স্নানের পর খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া মানেই (ভাত + মাছ) × (তেল + নুন মশালা) + ডাল (তেল + নুন) টু দি পাওয়ার পাঁচফোড়ন ÷ জল + আলু- কুমড়োর ঘ্যাঁট + চাটনি + দই। একেবারেই সরল অঙ্ক।

ভাতও এমনি এমনি হয় না। সেটাও আরেকটা সরল অঙ্ক। অর্থাৎ ভাত = (চাল + জল) × উত্তাপ। ঠিক ঐ রকমভাবেই আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁটের, চাটনির আর দই-এর একটা করে ফরমূলা আছে।

ইস্কুলে যাবার জন্যে বঙ্কবাবু যখন মিনিবাসে বা বাসে চড়েন তখন পরিষ্কার টাইম অ্যান্ড ডিস্ট্যান্সের অঙ্ক চোখে দেখতে পান। একটা বাসের চেয়ে একটা মিনিবাস দ্বিগুণ গতিতে ছুটলে বাসের চাইতে দশ মিনিট দেরিতে চলতে শুরু করেও মিনিবাস বাসকে কখন ওভারটেক করবে? কিংবা ডবলডেকার বাস একটা চলন্ত ট্রামকে কতক্ষণে অতিক্রম করে? ঘড়ি দেখে, দূরত্ব আন্দাজ করে এবং ট্রাম ও বাসের দৈর্ঘ্য আন্দাজ করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা বের করে ফেলেন।

এইভাবে অঙ্ক প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে বঙ্কবাবু প্রতিদিনই ঠিক স্টপেজে নামতে পারেন না। দু-তিনটে স্টপেজ পার হয়ে যান। তাই ইস্কুলে পৌঁছতে খানিকটা হাঁটতে হয়। ফলে ইস্কুলে লেট হয়ে যায়। তাই তিনি ঠিক করেছেন বাড়ি থেকে আধঘণ্টা আগে বেরোবেন আর ঘড়িটাকেও আধঘণ্টা ফাস্ট করে রাখবেন। তাহলে ঘড়ির অঙ্কটাও দারুণ ঝালাই হয়ে যাবে।

ইস্কুলে পৌঁছে ক্লাসে ঢোকেন বঙ্ক স্যার। সকাল থেকে ইস্কুলে ঢোকার সময় পর্যন্ত প্রচুর অঙ্ক তাঁর মাথায় গিজগিজ করতে থাকে। এত অঙ্ক যে মাথাটা ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে যায়। তাই ব্ল্যাক-বোর্ডে একটা অঙ্ক করতে দিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়েন। বসলেই অঙ্কের চাপে ঘুম পেয়ে যায়। ঘুম পেলেই চেয়ারটা ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আর দাঁড়াতে চায় না। ৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পেছনের দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে শেষে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পরিণত হয়। ব্যস, তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে ০ ডিগ্রিতে। এইভাবে চেয়ারসুদ্ধ বঙ্ক স্যার ঘুমোতে ঘুমোতে একবার পড়ে গিয়েছিলেন। ক্লাসের সব ছেলের চিৎকারে সারা ইস্কুলে একটা বিরাট শব্দদূষণ ঘটেছিল, হ্যাই অঙ্কবিহারী স্যার অঙ্কের জটিল তত্ত্বে বিহার করতে করতে পড়ে গেছেন রে। ধর...ধর...

তাই আজকাল ব্ল্যাক-বোর্ডে অঙ্ক দিয়ে বঙ্ক স্যার চেয়ারে বসার পর মনে মনে একটা ছড়া সংশোধন করার চেষ্টা করেন ছন্দ মেপে মেপে, যাতে ছন্দের অঙ্কটাও রপ্ত হয়ে যায়। ভুল-ভাল ছড়াটা ছেলেরাই একদিন লিখে রেখেছিল ব্ল্যাক-বোর্ডে—

ব্ল্যাক-বোর্ডে অঙ্ক দিয়ে এত্ত বড়ো
অঙ্ক স্যার তো প্রায় ঘুমিয়ে পড়ো পড়ো
এমন সময় হতচ্ছাড়া বঙ্কা
পেছন থেকে জোরসে বাজায় ডঙ্কা
চমকে উঠে স্যার পড়ে যায় ধরো ধরো।

ছেলেরা তো আর জানে না যে ছড়া লিখতে গেলে ১৪ মাত্রার অঙ্কটা শেখা বিশেষ দরকার। ৮ + ৬ নাকি ৪ + ৪ + ৬ নাকি ৮ + ৩ + ৩, নাকি ২ + ২ + .....!

ছবি : সৃষ্টি

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ. ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং বামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

বইমেলায় বেরুলো

বাংলা সাহিত্যে দেব সাহিত্য কুটীরের অনবদ্য অবদান

# অমরবীর কাহিনী

ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া বীরদের নতুন করে চিনিয়ে দেবার জন্যেই দেব সাহিত্য কুটীরের এই প্রচেষ্টা। যুগ যুগ ধরে ভারতমাতাকে রক্ষা করার জন্যে যে বীররা অমর হয়েছেন তাঁদেরই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রজন্মের সামনে, বার্ষিকীর আকারে। ঝকঝকে ছাপা, পাতায় পাতায় ছবিতে ভরা এই বইটি ছোট বড় সকলকে ইতিহাসের পথ বেয়ে নিয়ে যাবে নতুন এক জগতে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের দ্বিতীয় বই

## ভাঙাবাড়ির রহস্য

গত বইমেলায় এই সিরিজের প্রথম বই

## কেল্লা রহস্য

বেরিয়েই বাজার মাত করে দিয়েছিলো

গৌরী দের

## গা ছমছমে ভূতের গল্প

ভয়ে আতঙ্কে ভরা প্রতিটি গল্পই শিহরন জাগানো!

লেখিকার আর একটি বই—

## রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের **সোনার মেডেল**

সকলের ভালো লাগার মতো একটি বই প্রত্যেকটি গল্পই বারবার পড়ার মতো। নতুন স্বাদের, নতুন মেজাজের এবং নতুন ধরনের গল্পের বই যা ছোট বড় সকলকে নতুন পথের হদিশ দেবে।

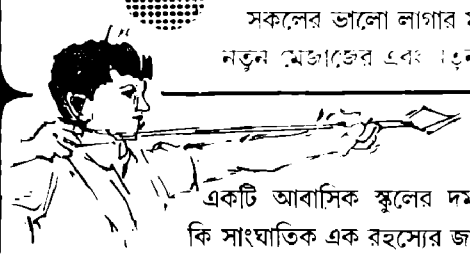

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের **তীরন্দাজ**

একটি আবাসিক স্কুলের দম বন্ধ করা পরিবেশ। তারই মধ্যে ছেলেরা খেলছে, তীর ছুঁড়ছে কিন্তু তারা জানে না কি সাংঘাতিক এক রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছে তারা। আর ঐ পোড়োবাড়ির ভূত—যার ভয়ে ছেলেরা কাঁপছে—সেই ভূতের রহস্যই বা কি! রোমাঞ্চের ঘেরাটোপে মোড়া এই বইটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের।

আবার ছাপা হলো

ছোটদের ভালো লাগার মতো দুটি দুর্দান্ত বই

## সোনার কাঠি

## রাক্ষস খোক্কস

Dr. Chandra's

## SOURCES OF ENERGY

New book in this series

# The Story of Geothermal Energy

Already Published

## The Story of Wind Energy, The Story of Petroleum
## The Story of Nuclear Energy
## The Story of Water Energy, The Story of Coal
## The Story of Solar Energy

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

# অম্লরোগ ? ক্ষুধামান্দ ? কোষ্ঠ্যকাঠিন্য ?

পেটের গোলমাল ?

## স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

সর্বাধিক রোগের কারণ পেটের গণ্ডগোল ও অসুস্থ লিভার। যদি সুস্বাস্থ্য চান — পেটের গোলমাল সারান আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

... ডাঃ সরকার

পেটের গোলমাল সারাতে আর লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার— আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

লিভোসিন

**ব্যবহার বিধি ঃ**

দু-চা চামচ করে লিভোসিন এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না-বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর লিভার সুস্থ হয়।

# লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের সহযোগী সংস্থা Jupiter -এর আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ
২৫, ইডেন হস্পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩
ফোনঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪

Jupiter
Emars Allen
allen's india
Dr. Sarkar Group

অ্যালোপ্যাথিক আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারক

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Marketed by :
allen's india Allen's India Marketing Pvt. Ltd.
ArnikaPlus Apartment, Sealdah
35, A. P. C. Road, Calcutta-9
Phone : 350-9026
Allen Apt : 351-0062

Allen's Ad. India